দুঃসংবাদ

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী

শ্রীহট্ট লেখক ও শিল্পী সংঘ

প্রকাশক :—
দেবেন্দ্রকুমার শ্যাম
মডার্ণ বুক ডিপো,
শ্রীহট্ট।

প্রথম সংস্করণ—১৩৫২

মূল্য—দুই টাকা

প্রচ্ছদপট শিল্পী : খালেদ চৌধুরী

প্রাপ্তিস্থান : ডি, এম লাইব্রেরী, কলিকাতা।
মডার্ণ বুক ডিপো, শ্রীহট্ট।
গ্রন্থকার, শ্রীহট্ট।

মুদ্রাকর :—
শ্রীসারদাচরণ দাস
আনন্দ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,
শ্রীহট্ট।

দুঃসংবাদ

বইখানিতে ভুলভ্রান্তি রহিয়া গেল, নিজেরই দোষে—-কর্ম-ব্যস্ততা ও অনুপস্থিতি নিজের পক্ষে ছাপার ভুল সংশোধনে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহা নিশ্চয়ই দুঃসংবাদ। কিন্তু উপায়ান্তর ছিল না।

লেখক।

দুঃসংবাদ

প্রত্যাবর্ত্তন

নূতন পৃথিবী

জীবনী

জন্মদিন

দুঃসংবাদ

এদিকে—

একদিন সহর-প্রবাসী চৌধুরীবাবুদের জয়নগরের পল্লী-নিবাস সকন্যা বড়কর্তা নবকৃষ্ণের আকস্মিক গ্রাম-প্রত্যাবর্তনে কর্মচাঞ্চল্যে ও জনকোলাহলে মুখর প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেদিন কি-জানি-কেন যেন সহসা তাহা স্তব্ধ গম্ভীর হইয়া গেল এবং সেখানকার অধিবাসীদের ত্রাসের সঞ্চার করিল। নিশ্চয়ই দুর্ঘটনা কিছু ঘটিয়াছে, তাহারই দুঃসংবাদে এতোবড় বাড়ীখানি মুহূর্তে মুষড়াইয়া পড়িয়াছে।

বাড়ীর কর্তা নবকৃষ্ণ চৌধুরী মশায় চুরুট মুখে দোতলার বারান্দায় রেলিংএ ভর দিয়া বাড়ীর সম্মুখের টানা পথের যে বাঁকটি দূরে গাঁয়ের ঘন বাঁশঝাড়ের মাঝে সহসা হারাইয়া গেছে, সেদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। চুরুটের পর চুরুট পুড়িয়াছে, নবকৃষ্ণের প্রতীক্ষার সমাপ্তি ঘটে নাই।

সাড়ে দশটায় সেই বাঁকে আকাঙ্ক্ষিত লোকটার আবির্ভাব ঘটিল। হাঁ, সেইতো, চৌধুরীবাবুদের সেই চট্‌পটে কর্মনিপুণ খাসভৃত্য রতনই সাইকেল চড়িয়া আসিতেছে। ওই তো সেই তেনেরই ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া সাইকেল চালনা—সাইকেলের গতি-বেগকে বর্ধিত করিবার দুর্দান্ত চেষ্টা। নিশ্চয়ই রতন। গায়ে সেই সবুজ জামা আর কোমরে-বাঁধা লাল চাদর। ওই তো তাহার দীর্ঘ চুল উল্টোবাতাসে আর মাথার দোলানিতে মুখের উপর উড়ঝাপ্‌টা খেলিতেছে।

নবকৃষ্ণ চুরুটটী দাঁতে চাপিয়া ধরিলেন শক্ত করিয়া। এক হাতে কোচা ধরিয়া পায়ের জুতা মৃদু খট্ খট্ বাজাইয়া সিঁড়ি বাহিয়া দোতলা হইতে তিনি নামিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্বাহ্ণিক চায়ের ট্রে লইয়া ভৃত্য নিতাই সবেমাত্র সিঁড়ির শেষ ধাপে পা' দিয়াছিল, সন্তর্পণে ট্রেখানি মাথার উপরে তুলিয়া ধরিয়া দেয়াল ঘেসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। ক্ষ্যান্ত ঝি নীচের তলায় বারান্দায় দাঁড়াইয়া সহর আর গ্রামের জলহাওয়া ও আদবকায়দা ইত্যাদির মধ্যে কি আকাশ পাতাল প্রভেদ তাহা নিয়া চৌধুরী-দের পল্লীনিবাসের প্রাচীন ভৃত্য ষষ্ঠীচরণের নিকট বক্তৃতা করিতেছিল, জুতার পরিচিত মৃদুধ্বনি সে বক্তৃতা সহসা স্তব্ধ করিয়া দিল। দপ্তরখানায় কর্মচারীদের গুঞ্জনধ্বনি বন্ধ হইয়া গিয়া জাগিয়া রহিল শুধু কাগজ কলমের অদ্ভুত খস্‌খসানি। কাছারীবাড়ীর দালানের সম্মুখে সবুজ ঘাসে ভরা বড় উঠোন-টীতে একটী সাদা আর একটী কালো নধর ভেড়ার খাসি দড়ি-বাঁধা অবস্থায় ঘাস খাইতেছিল, তাহারাও মুখ তুলিয়া চাহিয়া রহিল। দালানের ছায়ায় একটী বড় ঝুড়িতে থাকিয়া কতকগুলি মোরগ লেজ নাড়িয়া কোঁকর কোঁক্ শব্দ করিয়া উঠিল।

ধূলিময় পথ ছাড়িয়া যেখানে ঘাসের জমিতে পা' দিতে হয়, সেখানেই নবকৃষ্ণ রতনের নাগাল পাইলেন। রতন আলগোছে সাইকেল হইতে নামিয়া মুখ হইতে দীর্ঘ চুলের আবরণ উন্মোচন করিতে লাগিল।

নবকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরে রতন, পাওয়া গেল ?

রতন মুখখানিকে যতদূর সম্ভব গম্ভীর ও বিমর্ষ করিয়া উত্তর করিল, পাওয়া গেলনা হুজুর।

পাওয়া গেলনা? নবকৃষ্ণ মুখ ফিরাইলেন। এইবার মুখের চুরুটটী ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়াছেন, প্রত্যাবর্ত্তন পথে কোচাটি ঘাসের উপর দিয়াই লুটিয়া চলিয়াছে।

সারা বাড়ীখানি কি এক আশঙ্কা ও উদ্বেগে থম্‌থম্ করি-তেছে। বাড়ীর এক পাশে অতিথি বাড়ীর বাংলোর তোরণে যে লতাপাতার কারুকার্য সাজসজ্জা চলিতেছিল সেখান হইতে চটী পায়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে জমা সেরেস্তার অধরকান্ত নিকটে আসিয়া নাকের উপর হইতে চশমাটি অপসারিত করিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কর্তার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নবকৃষ্ণ দূর হইতে যেন আপন মনেই উচ্চারণ করিলেন, পাওয়া গেলনা।

বাড়ীর সর্বত্রই চাপাকণ্ঠে শুধু উচ্চারিত হইতেছে, পাওয়া গেলনা?

দপ্তরে প্রবেশ করিয়া অধরকান্তও নির্বাক কর্মচারীদের সম্মুখে হতাশার ভঙ্গী করিয়া কহিলেন, পাওয়া গেলনা!

ক্ষান্ত কহিল যষ্ঠীচরণকে, আরে ষষ্ঠে, পাওয়া গেলনা?

ষষ্ঠীচরণ দৌড়াইয়া গেল নিতাইএর কাছে, বুঝলে নিতাই, পাওয়া গেলনা।

নবকৃষ্ণের মেয়ে মণিকা তার খাস কক্ষে ইজিচেয়ারে এলাইয়া পড়িয়া নৃত্যশিল্পের একখানা সচিত্র বই পড়িতেছিল।

তাহার কাছে গিয়া নিতাই ডাকিল, দিদিমণি! শুনেছ?

দিদিমণি মণিকা বইয়ের পৃষ্ঠা হইতে মুখ না তুলিয়াই কহিল, হুঁ!

দিদিমণি! পাওয়া গেল—না। বলিয়া নিতাই মুখকে হতাশায় কুঞ্চিত বিকৃত করিয়া তুলিল। মণিকা যেন নিতাই-এরই কথারই পুনরাবৃত্তি করিল, পাওয়া গেলনা। তারপর সহসা সে আত্মসম্বিত ফিরিয়া পাইল। বইখানা গুটাইয়া রাখিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, তাইতো! পাওয়া গেলনা?

নবকৃষ্ণ ততোক্ষণে গিয়া দ্বিতলে নিজের কামরায় আরাম কেদারায় গুম্ হইয়া বসিয়াছে। পাশেই গড়গড়ায় অম্বুরী তামাক জ্বলিয়া কখন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, তথাপি তিনি সেই গড়গড়ারই রূপো-বাঁধান নলটি মুখে পুরিয়া টানিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ষষ্ঠীচরণ ছুটিয়া আসিল, কল্‌কে ফিরাইয়া দিবে। সে হাত বাড়াইবা মাত্রই নবকৃষ্ণ ধমক দিয়া উঠিলেন, না, থাক্।

কক্ষটী নিস্তব্ধ নিঝুম। বারান্দার দেয়ালে বড় ঘড়িটী টিক্ টিক্ করিয়া বাজিতেছে। আর নবকৃষ্ণ মাঝে মাঝে নিঃশেষিত-অম্বুরী গড়গড়ার নল মুখে পুরিয়া টান দিতেছেন, কখনো বা দাঁতে কামড়াইয়া ধরিতেছেন।

ওদিকে—

চৌধুরী বাড়ীর দক্ষিণ পাশে খাসমহল হইতে সম্পূর্ণ আলাদা

পূজোবাড়ীর আঙ্গিনায় সকাল হইতেই একটা জনতা জমিয়া উঠিয়াছিল। সে-অঞ্চলেরই অধিবাসী তাহারা—ছেলে বুড়ো, নরনারী, কিশোর কিশোরী, মায়ের বুকের দুধটানা শিশু পর্যন্ত। সময়টা পূজাপার্বন বা উৎসবের সময় নয়, তাহার জন্য এই জনতার সমারোহও নয়। এজনতার লোকের উৎসব উপলক্ষে উৎসাহবোধের কিম্বা পূজাপার্বণে ধর্মবোধের অভাবও কবেই ঘটিয়াছে। ইহারা ক'দিন যাবত নিত্য আসে চৌধুরীদের বড়কর্তা নবকৃষ্ণেরই আহ্বানে। প্রতি প্রভাতে পূজোবাড়ীতে ইহারা আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়ায়। বেলা ন'টায় কর্তাবাবু আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়ান। কর্মচারীরা ও গাঁয়ের মাইনর স্কুলের হেড্‌মাষ্টার কৃষ্ণদাস চক্রবর্তী রংচটা কালো জীর্ণ কোটের উপর কোমরে চাদর বাঁধিয়া, তলাফাটা রবারের জুতো পায়ে চারদিকে অতিব্যস্ত ভাবে ছুটাছুটি আরম্ভ করেন। কর্তারই সম্মুখে পূজোবাড়ীর ভাঁড়ার ঘর খোলা হয়, তারপর সেই জনতার মধ্যে করা হয় চাল বিতরণ। এই জনতা ক্ষুধার্ত ও ভিক্ষার্থী জনতা।

এই গাঁয়ের আশে পাশে ক'খানা গাঁয়ের যতগুলি দেহে প্রাণ তখনও টিকিয়াই ছিল, জীর্ণ অস্থিকংকালের মাঝে ধুঁকিতে ধুঁকিতে বর্তমান যুদ্ধের নামে শিহরিয়া উঠিতেও যাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহারাই একদা নিদ্রাহীন নিশীথে সতেজ সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। দিনের আলোয় লোকচক্ষের সম্মুখে বাস্তু ত্যাগ করিয়া যাইতে নাই এই সংস্কারটুকু তখনো তাহাদের অবশিষ্ট আছে, তাই রাতের অন্ধকারে সেই সজীব কংকালগুলি নীরবে

ভীড় করিয়া চলিয়াছিল গ্রাম ছাড়িয়া। দেশের সর্বত্রই কি ধান চাল হঠাৎ উধাও হইয়া গেছে, ম্যালেরিয়ার মহামারী লাগিয়াছে, জীবনের কোন আশ্বাসই অবশিষ্ট নাই ?

গাঁয়ে সদ্য-আগত চৌধুরীবাড়ীর নবকৃষ্ণ সেই গভীর রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, বাধা দিয়াছিলেন। রাত্রির অন্ধকারে দাঁড়াইয়া তিনি একটা ছোট বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তোমাদের মুখে অন্ন দেবার জন্যেই আমি সহর থেকে ছুটে এসেছি। কেউ আমরা নিশ্চিন্ত বসে নেই। স্বয়ং ভারত সরকারের মন্ত্রী এসে পরামর্শ দিয়ে গেছেন, তোমাদের খোঁজ খবর নিয়ে গেছেন। আমাদের মন্ত্রী আস্‌ছেন, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট আস্‌ছেন, নেতারা আস্‌ছেন তোমাদের আহারের ব্যবস্থা করতে। আমিও তাই ছুটে এসেছি, নইলে—জান তো—! তোমরা ফিরে যাও, যে-কদিন তোমাদের জন্যে নঙরখানা অর্থাৎ ভোজনাগার খোলা না হচ্ছে—সে-ক'দিন প্রতিদিন সকালে আমারই পূজোবাড়ীতে—বুঝলে—?

কংকালের শোভাযাত্রায় জীবনের সমারোহই জাগিয়াছিল, বড় বাবুর জয় হোক।

আজও তাই পূজোবাড়ীতে সবাই আসিয়াছে। জনতা আসিয়া বসিয়া আছে সকাল হইতে। ন'টা কখন বাজিয়া গেছে। সাড়ে ন'টার পর হেড্‌মাষ্টার কৃষ্ণদাস ভাঙ্গা দড়িবাঁধা চশমার উপর দিয়া পথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনেক আনাগোনা করিয়াছেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী রাজীবলোচন বার দুই খাস মহলের সম্মুখ

হইতেও ঘুরিয়া আসিয়াছে। চৌধুরীবাড়ীর অপ্রত্যাশিত থম্‌-থমে স্তব্ধতার মাঝে সে সাড়া জাগাইতে সাহসী হয় নাই।

শুধু সদর নায়েব মশাইকে সে প্রশ্ন করিয়াছিল, তিনি জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া উপরের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, রক্ষে কর রাজীব, নিজেও রক্ষে পাও,—ওই দেখ।

রাজীব একবার মাত্র চোখ তুলিয়া উপরের দিকে চাহিয়াছিল, নবকৃষ্ণ চুরুট মুখে দূরে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তার পর প্রাণ নিয়াই সে পূজোবাড়ীতে ছুটিয়া আসিয়াছে। অবশ্য বুঝিতে পারে নাই প্রাণভয়টা কিসের জন্য ?

কিন্তু অধৈর্য জনতাকে চলিয়া যাইতেও কেহ বলিতে পারে-না—রাজীব তো নহেই। শুধু হেড্‌মাষ্টারের প্রশ্নের উত্তরে রাজীব বলিতে পারে,—পাওয়া গেল না।

শিশুরা কান্না জুড়িয়া দিয়াছে, মায়ের বুক চুষিয়া চুষিয়া তাহারা শুষ্ককণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। একটি কংকালসার মেয়ে কোলের শিশুটীকে দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া সেই শীর্ণ শিশুর ক্ষীণ কণ্ঠের আর্তনাদ আর আছাড়ি পিছাড়ি একাগ্র দৃষ্টিতে যেন কৌতুকভরে লক্ষ্য করিতেছে। একটি বৃদ্ধ হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া সেই যে সকালে আসিয়া বেলগাছটীর তলায় ঠেস দিয়া বসিয়া-ছিল এখনও তেমনি আছে, যেন নিষ্পন্দ, নিথর। কৈবর্তদের মেয়ে তারই কিছুদিন পূর্বেরও যৌবনপুষ্ট দেহকে আজও স্বভাব-বশতঃ লোকচক্ষুর লোভাতুর শ্যেনদৃষ্টি হইতে ঢাকিবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিয়া এখন প্রায় উন্মুক্ত দেহেই পূজোমন্দিরের

দুঃসংবাদ

চাতালের পাশে নেতাইয়া পড়িয়াছে। কিছুক্ষণ আগেও দাস-পাড়ার নরনারীদের মধ্যে একটা ঝগড়া হইয়া গেছে, উপলক্ষ কচুগাছ। কাল রাত মহিমা দাসের নালার অবশিষ্ট কচুগুলি কাহারা চুরি করিয়া কাটিয়া লইয়া গেছে, যুগলের স্ত্রীই যে তাহা করিয়াছে মহিমার মায়ের তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন তাহারাও শান্ত স্থির, ঝগড়ার দাপট আর চলে না। মুসলমানরা পাঞ্জা-বাড়ীর পবিত্রতা বজায় রাখিয়া বাহিরে রাস্তার পাশে উচু তাল-গাছটার চারপাশ বেড়িয়া অনেকক্ষণ [illegible] করিয়াছে, এখন তাহারাও নিঝুম। সূর্যের তেজ বাড়িয়াছে, দিনটা একটু পরেই খাঁ খাঁ করিতে থাকিবে, কিন্তু লোকগুলি [illegible] একটু-খানি চেতনা নিয়া আসিলেও এখন [illegible] ঘুমাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

তারই হঠাৎ যেন ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিল। অনেক বেলা হইয়া গেছে। গৃহে রুগ্ন স্বামীর শুষ্ক কাতর মুখ [illegible] যেন তাহার মনে পড়িল। সে আর অপেক্ষা করিতে পারে না। তাহার মনে হয়না চাল নিয়া না গেলে স্বামীর মুখে কি দিবে, শুধু ভাবে স্বামী তাহার পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছে। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়ায়, একবার চারদিকে চাহিয়া মাটীর শূন্য পাত্রটী হাতে তুলিয়া লয়। তারপর চলিতে থাকে। শীর্ণ শুষ্ক দেহের সম্বিত রক্ষার জন্য জীর্ণ খাটো কাপড় লইয়া টানাটানি করিবার, দেহকে কুণ্ঠিত করিয়া চলিবার কথাও সে ভুলিয়া গিয়াছে, শুধু পথ চলিতেছে দুর্বল পা' দু'টীকে যথাসাধ্য জোরে

দুঃসংবাদ

টানিয়া টানিয়া।

জনার্দন পাল উঠিয়া কৃষ্ণদাস মাষ্টারের কাছে গিয়া ডাকিল, হেডমাষ্টার বাবু!

কৃষ্ণদাস চশমার উপর দিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন, কে? পাল নাকি?

—আজ্ঞে হাঁ, হেডমাষ্টার বাবু। জনার্দন বলিল, আজ কি কর্তাবাবু আর আসবেন না?

হেড্‌মাষ্টার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন, কিছুইতো বুঝ্‌ছিনা পাল। কালই তো মন্ত্রী আর ম্যাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব আসবেন, ভোজনাগার খোলা হবে—আর আজই কর্তাবাবু অনুপস্থিত। কি যে হল, কেন যে পাওয়া গেলনা?

কাল তৈরী খাবার আমরা পাব, নয় হেড্‌মাষ্টারবাবু?—জনার্দন ভাগাইয়া চলিল।

রাজীবলোচন তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিল। বলিল, যেয়োনা পাল, অপেক্ষা কর। কর্তাবাবু নিশ্চয়ই আসবেন। নইলে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌-সাহেব কাল এসে কি বলবেন? তিনি আবার কর্তাবাবুর বন্ধু কি না, আমি স্বচক্ষে একসঙ্গে তাঁদেরে চা খেতে পর্যন্ত দেখেছি।

জনার্দন চলিতে থাকে। বলিল, কালই আবার আসব।

রাজীব বাধা দিল, দু'দিন থেকে তোমার মেয়েকে তো দেখছি না পাল, ওই কি নাম?

জনার্দন ফিরিয়া অগ্নি-দৃষ্টিতে রাজীবের দিকে চাহিতেই রাজীব মুখ ফিরাইয়া দূরে সরিয়া গেল।

হেড্‌মাষ্টার একবার রাজীবের দিকে আবার জনার্দনের দিকে চাহিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, খুব ভাল করেছ পাল, রূপ্‌সীকে আসতে না দিয়ে। বুঝ্‌লে পাল, বেশ করেছ।

জনার্দন চলিয়া গেল।

সেদিকে—

বড় ঘরখানির বারান্দায় বাহিরের দিকে দৃষ্টি মেলিয়া বসিয়া আছে রূপসী, জনার্দনের বিধবা মেয়ে। দৃষ্টি তাহার রুদ্ধ হয়না, বাধাও পায়না—অনেক দূর চলিয়া যায়। এককালের টিনে-ছাওয়া ঘরখানি কিছুদিন আগে ভাঙ্গিয়া গোরুর গাড়ী চড়িয়া ফকিরচাঁদ মহাজনের বাড়ী পৌঁছিয়াছে। পুকুর পারের আম গাছগুলি কবেই বিক্রী হইয়া গিয়াছিল, অবশেষে বাড়ীর সম্মুখের বাঁশঝাড়গুলিও সাব্‌কণ্ট্রেক্‌টার তারাচরণের লোকগুলি উজাড় করিয়া কোথায় নিয়া চালান দিয়াছে। ঘরদোর বনবাদাড় সমস্ত উজাড় করিয়াও কিন্তু পালেদের বাড়ীর সবগুলি লোক কেহ কেহ বা বাঁচিয়া আর কেহ কেহ বা গাঁয়ে বর্তিয়া থাকিতে পারিল না। রহিল শুধু বৃদ্ধ জনার্দন আর তাহার যুবতী বিধবা মেয়ে রূপসী। রূপসী আজ ঘরে বসিয়াই দেখিতে পায় পুকুরের অপর পারে ধানক্ষেতের পাশে যে ক্ষুদ্র ডোবাটি, তারই চারপাশ ঘিরিয়া বহু মৃতের শ্মশান বিরাজ করিতেছে। শ্মশানগুলিতে কাপড়ের ধ্বজা আর উড়েনা, শুধু ভাঙ্গা মাটীর কলসী আর কুলা ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। তারও আরো দূরে একপাল শকুনি

গলা বাড়াইয়া দূরে দূরে বসিয়া আছে। খাদ্য তাহাদের নিঃশেষ হইয়া গেছে, তথাপি গাঁয়ের পানে চাহিয়া বসিয়া আছে কিসের প্রত্যাশায় ? যুদ্ধ আর পেটের দায় এ অঞ্চলের সতেজ মাংসল গোরুগুলিকে তো কবেই গোগ্রাসে গিলিয়াছে, জীর্ণশীর্ণ বৃদ্ধ আর শিশুরাও কবেই মরিয়াছে, কোনটা বয়সের জন্য কোনটা বা মাকে হারাইয়া—তারপর মড়ক। গোমড়ক আর মানুষের মড়ক দুইটাই পাশাপাশি চলিয়াছে। কিন্তু এবার তো শুধু মানুষের মড়ক চলিতেছে—ইহাদের আর ভরসা কি ?

রূপসী দৃষ্টি ফিরাইয়া আনে। শকুনিগুলি তাহার প্রাণে কি এক আতংক জাগাইয়া দেয়।

তাহার বাবা, জনার্দন। এক কালের দৃঢ়পেশী উন্নতদেহ সুস্থ সবল জনার্দন আজ বৃদ্ধ, জীর্ণ. ভগ্নদেহ—দেহের মাঝখান ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, মেরুদণ্ড বাঁকা হইয়া গেছে। এক কালের মধ্যবিত্ত জনার্দন পাল। সে একেবারে চাষা ছিলনা, সে ছিল গৃহস্থ ব্যবসায়ী, গাঁয়ের মাতব্বরদের একজন। যেন অকস্মাৎ যুদ্ধের ভোজবাজীতে সে হৃতবল, কাঙাল, সর্বহারা। জনার্দন আসিয়া ধপ্ করিয়া বারান্দায় বসিয়া পড়িয়া একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়া হাঁফাইতে লাগিল।

রূপসী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাবার পাশে গিয়া বসিল, ডাকিল, বাবা !

জনার্দন কোন উত্তর দিল না।

রূপসী বাবার পাশ ঘেঁষিয়া কহিল, তোমার যেতে আসতে

খুব কষ্ট হয়েছে বাবা? তা'ছাড়া—

রূপসী খুঁজিতেছিল, জনার্দন কিছু নিয়া আসিয়াছে কিনা।

জনার্দন কিছুটা সামলাইয়া লইয়াছে। সে ঝাঁঝালো কণ্ঠে কহিল, খুব কষ্ট হল বৈকি? তাছাড়া কিছুই তোমার জন্যে আজ নিয়ে আসিনি।—পাওয়া গেলনা।

—পাওয়া গেল না? —রূপসী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া গুম্ হইয়া বসিল।

জনার্দনের কণ্ঠ তীব্রতর হইয়া উঠিল, তুই যেতে পারিস্ না, আবার বলিস আমার কষ্ট হয়। কি এমন ভদ্দর হয়ে গেছিস্, লোকের মাঝে গেলে জাত যায়? বামুন, কায়েত, মালী, নমসূত্র সবাই যে এক-জাত হয়ে গেছে, তোর আবার ভদ্রতা? জনাপাল যেতে পারে হাত পাততে, তার মেয়ের আবার —

আহত কণ্ঠে রূপসী বলিল, তুমি বুঝনা বাবা, কেন আমি আর যেতে চাইনা।

—খুব বুঝি। বুঝিনা? জনার্দন হুংকার দিয়া উঠে। তোর আবার কি এমন? তুই গেলে যেরকম করে হোক কিছুটা পাওয়া যেতই। দে এখন উপোস দে।

রূপসীর চোখে জল আসিল। সে শুধু উচ্চারণ করিল, বাবা!

জনার্দনের কণ্ঠ তেমনি কর্কশ, কি লজ্জারে! সতীলক্ষ্মী! কতো মেয়েই তো প্রাণ বাঁচাবার জন্যে কতো কিছু করছে······ সহসা জনার্দনের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

রূপসী আর্তকণ্ঠে কহিল, আমি যে তোমার মেয়ে বাবা !

আমার মেয়ে ! তাইতো ! জনার্দন শিহরিয়া উঠিল। সে আর রূপসীর দিকে চাহিতে পারেনা। গাঁয়ের মাতব্বর জনার্দন, পঞ্চায়েতের মাথা ন্যায়-বিচারক জনার্দন, নিজের সমাজের উপদেষ্টা জনার্দন, বৃহৎ একটি পাল পরিবারের পরিচালক জনার্দন—সে কি বলিতে যাইতেছিল ?

জনার্দন উঠিয়া দ্রুত পদক্ষেপে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

জনার্দন চলিয়াছে। কোথায় যাইবে সে জানেনা। সে উদ্দেশ্যবিহীন শুধু গতিশীল। পাশেই পালপাড়ার অনেকগুলি বাড়ী, নীরব নিঝুম। একটী ভাঙ্গা ঘরের ভিতর হইতে কা'র ক্ষীণকণ্ঠের কাতরাণী ভাসিয়া আসিতেছে, আর কোন সাড়া নাই। দাসপাড়ায় দীনুদাসের বাড়ীতে নূতন সজীবতার লক্ষণ। দীনুর স্ত্রী বারান্দায় বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতেছে আর দীনু হুক্কায় তামাক টানিতেছে। দীনুর স্ত্রীই দিন কিছুটা ফিরাইয়াছে, তাহার চেহারায়ও তৈলাক্ত মসৃণতা আসিয়াছে। জনার্দন দূর হইতে দীনুর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হানিল, ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ। আগে হইলে জনার্দন দীনুকে শুধু একঘরেই করিত না, স্বামী স্ত্রীর মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া—

জেলে পাড়ার এক পাশে রুদ্ধদ্বার ঘরের সারি, আর অন্য পাশে দূরে শ্মশানের ছড়াছড়ি। কতো মরিয়াছে, কতো আছে

হিসাব করিবার উপায় নাই। মৃত্যু, পলায়ন, ভিক্ষান্বেষণ। পাড়াটী খাঁ খাঁ করিতেছে। এই দুপুরের নির্জনতা, রোদের আলোতেও ভয়াবহ স্তব্ধতা। নীরবে যেন এই রুদ্ধদ্বার গৃহগুলির মাঝে ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া আছে অসংখ্য নরমাংসলোলুপ দৈত্য দানবেরা। জনার্দনের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে।

ভজহরি রায়ের বাড়ীর শক্ত করিয়া বাঁধা টিনের দেয়াল ঘেরা ধানের উঁচু ভাঁড়ার ঘরের পাশে সে আসিয়া দাঁড়ায়। সে জোরে জোরে শ্বাস গ্রহণ করিতে থাকে। মনে করিয়া দেখে এতোক্ষণে তাহার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায় নাই তো!

ভজহরির ভাঁড়ারে ধান আছে, সিন্দুকে টাকাও আছে, কিন্তু প্রাণে শান্তি নাই। সরকারী অস্থায়ী ডাক্তারখানার ডাক্তারবাবু, অন্যের মত কুইনিনের জল না-দিয়াও, কতো কি ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ইঞ্জেকসন দিয়াছিলেন, তথাপি ভজহরির স্ত্রী বাঁচে নাই। ভজহরিকেও ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছে। এই ম্যালেরিয়ার কাঁপুনির মাঝেও তাহাকে দোনলা বন্দুকটীকে সর্বদা হাতের কাছে রাখিতে হয়। কি-জানি তাহার গোলাভরা ধান আর সিন্দুকভরা টাকা, দলিল দস্তাবেজ!

জনার্দন চলে। গভীর বড় নালার পারে আসিয়া তাহার গতি ব্যাহত হয়। নালায় জল না থাকিলেও তাহা খুব গভীর। বাঁশের সাঁকোটী কে অপসরণ করিয়াছে। তা'ছাড়া অপর পারে গাছ আর ঘন ঝাড়ঝোপে অন্ধকার। এই দুপুরে রোদের তপ্ত

হাওয়াও সেখানকার ভিজা নীরবতায় সাড়া জাগাইতে পারে নাই।

পেছন হইতে কে ডাকিল, পাল মশায় নাকি ?

জনার্দন ঘাড় ফিরাইল। দাসেদের নারাণ, হাসিমুখে সে-ই প্রশ্ন করিয়াছে। নারাণের দেহে বর্তমান বিপর্যয়ের চিহ্ন মাত্র নাই। সে সহরে হাঁস মোরগের ডিম চালান দেয়, সাইকেল চড়িয়া সহরে যাতায়াত করে, তেড়ি কাটিয়া জুতা পরিয়া সিগারেট ফুঁকিয়া বেড়ায়। অবসর কালে গ্রামোফোনে সিনেমার গান বাজায় আর জনার্দনের বাড়ীতে সময়ে অসময়ে হানা দিয়া তাহাদের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া রূপসীর স্তুতিবাদ করিয়া রূপসীকে কৃতার্থ করিতে চায়।

জনার্দন তাতিয়া উঠিল, হ্যাঁ, কি চাও তুমি ?

হাসিয়াই নারাণ বলিল, না, অমনি, কেমন আছেন জিজ্ঞেস করছিলাম। রূপ্‌সী—

চুপ্‌ চুপ্‌—জনার্দন ধমক্‌ দিয়া উঠে।

নারাণের মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। সে বলিতে যাইতেছিল, এতো কেন ? অনেকই সে দেখিতেছে। কিন্তু আত্মসংবরণ করিল। জনার্দনকে সমীহ করিতেই তাহারা অভ্যস্ত। সে নীরবেই চলিয়া গেল।

জনার্দন বিড় বিড় করিয়া বলিল, হাড় গুড়ো করে দেব—হুতচ্ছাড়া। তারপর জনার্দন পেছন দিকে চাহিল। ঐ যে জারুল গাছটী ডালপালা মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে ঐ গাছের

ঐ ডালটীতে সেদিন গলায় দড়ি বাঁধিয়া ঝুলিয়াছিল রসিকের বড় মেয়ে ললিতা।

রূপ্‌সী! রূপ্‌সী! জনার্দ্দন ফিরিয়া ছুটিয়া চলিল বাড়ীর দিকে।

রূপসী গৃহে নাই, খোলা বাড়ীর কোথাও তাকে দেখা যায় না। কোথায় রূপসী?

জনার্দ্দন ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। ওই যে ডোবার ধারে শ্মশান ভূমি, কে একজন পড়িয়া আছে না?

হঁ্যা, রূপসীই। মায়ের শ্মশানের পাশে মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে আর রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিতেছে, মা, মাগো!

সে কি মায়ের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে?

এদিকে

চৌধুরী বাড়ীর দ্বিতলে নবকৃষ্ণের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল মণিকার করাঘাতে অপরাহ্ণ পাঁচটায়। দুপুরে আপন কক্ষেই মধ্যাহ্ন ভোজন সারিয়া নীরবে তিনি শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মণিকা জিজ্ঞাসা করিল, পাঁচটা বাজে, এখনো তুমি ঘরে বাবা?

নবকৃষ্ণ ম্লান হাসি হসিলেন, তাইতো মণিকা, কত কাজ।

নিশ্চয়ই! চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মণিকা কহিল। কি যে ভাবনা তোমার। যুদ্ধের হিড়িকে কতো কিছু যে দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে, সবাই জানে সবাই বুঝে। তার জন্যে এতো দুশ্চিন্তা কেন?

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া নবকৃষ্ণ কহিলেন, কিন্তু তুইতো জানিস মণিকা, মিঃ হ্যারিট প্রমফ্রেট ক্রাই, সেভরি টোষ্ট, স্নোবল পুডিং কতো পছন্দ করেন। তারপর ডাকরোষ্ট মাটন চপ্ উঃ—যাক্, এখন তোর কাকার উপরই ভরসা। এ বাড়ীর মান সম্ভ্রম—

সব হবে, সব থাক্‌বে, মণিকা হাসিতে হাসিতে কহিল, কিন্তু আমার দুর্ভিক্ষের এলবামগুলো আর রুমুদার স্কেচ্ রাতে এলে সাজাব কখন! এখানেতো তোমার ইলেক্‌ট্রিক লাইট নেই? বাবা!—আঁধারে নিজেই হাঁফিয়ে উঠি—আর ওতো ছবি।

তাও হবে—বলিয়া নবকৃষ্ণ চুরুট ধরাইয়া সংলগ্ন বাথরুমে প্রবেশ করিলেন।

বৈকালিক চা পর্ব্ব নবকৃষ্ণ সমাপ্ত করিলেন, একখানি সরভাজা আর এক কাপ চায়ে। অন্যান্য খাবার পড়িয়াই রহিল। তিনি যখন আর একটা চুরুট ধরাইয়াছেন, তখন ঢং ঢং করিয়া বারান্দার ঘড়িতে ছ'টা বাজিল।

রতন আসিয়া দাঁড়াইল!

চুরুট মুখেই নবকৃষ্ণ প্রশ্ন করিলেন, কিরে রতন! তোরা কোথায় কোথায় খুঁজেছিলি?

—সারা সহর হুজুর। রতন উত্তর দিল। তারপর কহিল এবার নীচে যাবেন হুজুর?

নিশ্চয়। নবকৃষ্ণ কহিলেন, কতকি কাজ বাকী আছে। মণ্ডপ

দুঃসংবাদ

সাজাতে হবে, ড্রয়িংরুমের পর্দাগুলো ঠিক ঠিক টাঙ্গানো হয়েছে কিনা—টিপয়, এসট্রে। সেই নতুন এসট্রের কথা তোরা নিশ্চয় ভুলে গেছিস্।

নীচে কাছারী বাড়ীতে রাজীবলোচন তখনো যেন হত্যা দিয়া পড়িয়া আছে।

নবকৃষ্ণ রাজীবকে প্রশ্ন করিলেন, চাল দেওয়া হয়েছে তো রাজীব? আর কালকার জন্যে সব ব্যবস্থা?

রাজীব তখন ম্রিয়মান শুষ্ককণ্ঠ। সে উত্তর করিল, হুজুর!

কথার উত্তর দাও—নবকৃষ্ণের কণ্ঠ তীক্ষ্ণ, তীব্র।

সারা কাছারীবাড়ী যেন কাঁপিয়া উঠিল। আমলা ভৃত্যেরা যে যেখানে ছিল সন্ত্রস্ত হইয়া দাঁড়াইল। সবাই নিশ্চল, নির্বাক। শুধু রতন কাছে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন হাত দিয়া তাহার দীর্ঘ চুল সামলাইতেছিল।

নবকৃষ্ণ কিছুক্ষণ নীরবে চুরুট টানিয়া গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করিলেন, মোটর আনতে বল। পূজোবাড়ীতে যাব।

রতন ছুটিল, ড্রাইভার, ড্রাইভার।

সকলেই নীরব অবস্থায় সচল হইয়া উঠিয়াছে—চারিদিকে ছুটিতেছে, মনে মনে সকলেই দ্রুতকণ্ঠে ডাকিতেছে, ড্রাইভার! ড্রাইভার!

লোকেল বোর্ডের পল্লীপথে মোটর চালনা, ড্রাইভার ও আরোহীর চেয়ে মোটরেরই প্রাণান্ত। মোটরখানিও তাই আপাততঃ বিগড়াইয়াছেন। কাল ভোরে হাঁসখালিতে মন্ত্রী ম্যাজিষ্ট্রেটের

অভ্যর্থনায় নবকৃষ্ণ স্বয়ং মোটর চড়িয়া যাইবেন। ড্রাইভার মোটরের তলায় পড়িয়া মোটরের পরিচর্য্যায় লাগিয়াছে। তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া ভার, তবে মোটরের তলা দিয়া তাহার দুখানা পা অবস্থান—স্থান নির্দেশ করে।

রতন হতাশভাবে নবকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার ঘন ঘন চুলগুলি সরাইবার ভঙ্গিতেই নবকৃষ্ণ যেন বুঝিতে পারিলেন, ব্যাপার কি। প্রায় সে একই কথা, পাওয়া গেলনা। তিনি চুরুটটী দাঁতে চাপিয়া ধরিয়া কোচা হাতে লইলেন।

হ্যাঁ তিনি পায়ে হাঁটিয়াই পূজোবাড়ীতে যাইবেন। কতখানিই বা পথ! কয়েক রশি!!

ওদিকে—

পূজোবাড়ী তখনও জনকোলাহলে মুখর। তবে ক্ষুধার্ত্ত ও ভিক্ষার্থী জনতা আর নাই। থাকিলেও এই সন্ধ্যায় ও তাহাদের কণ্ঠস্বর কোলাহল স্থষ্টি করিতে পারিত না। তাহাদের কয়েকজন এখনও পূজোবাড়ী ছাড়িয়া যায় নাই সত্য কিন্তু অন্য যাহারা সেই বাড়ীতে আছে, তাহারা ইহাদের উপস্থিতি মোটেই অনুভব করেনা। ইহারা ইতস্ততঃ এখানে ওখানে ফুল বাগানের ঝোপের পাশে গাছের তলায় শুইয়া আছে। তাহারা সাড়া দেয় না, সন্ধ্যার অন্ধকারে জীর্ণ বুকের স্পন্দনও লক্ষ্য করিবার নয়।

হেডমাষ্টার কৃষ্ণদাস আবার আসিয়াছেন। এবার আর

তাহার ছুটাছুটি নাই। তিনি পূজা মণ্ডপের বাঁধান চত্বরে একটা থামে পিঠ দিয়া দুই হাঁটুর মাঝে মুখখানি রাখিয়া অপলক দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁর সেই কোটরগত দৃষ্টি হইতে যেন এই জগতের বিরুদ্ধে একটা আক্রোশ তীব্র তেজে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে।

সহর হইতে আগত স্বেচ্ছাসেবক সত্যেশ আশেপাশের এবং এই গ্রাম হইতে যতখানি সুস্থ, অর্ধসুস্থ এবং আপাততঃ সুস্থ যুবক সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, তাহাদেরে লইয়া পূজোবাড়ীতেই কালকার ভোজনাগার উদ্বোধন ও খাদ্য পরিবেশন সম্পর্কিত ব্যবস্থার মহড়া দিতেছিল। কে কোথায় কি কাজ করিবে, কেমন করিয়া লাইন করিয়া লোকগুলিকে বসাইতে হইবে, কেহ ফাঁকি দিয়া একাধিকবার খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিলে কি উপায়েই তাহা রোধ করা যাইবে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত উপদেশ বাণীই সত্যেশ বিতরণ করিতেছিল।

সত্যেশের সহকারী বেণীমাধব ক্লান্ত দেহে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার কাঁধে একটা ক্যামেরা ঝুলিতেছে। সে গাঁয়ে গাঁয়ে সারা অপরাহ্ণ ফটো তুলিয়া বেড়াইয়াছে। সে ফিরিয়া সত্যেশকে কহিল, দেখে এলাম সব সত্যেশ, ছবিও নিয়ে এলাম —ছাপালে সংবাদপত্রের কাটতিও খুব হবে, কিন্তু এদের এমন করে বাঁচাতে পারবে না।

সত্যেশ হাসিয়া উঠিল, তুমি চিরকালই নিরাশাবাদী।

বেণীমাধব কহিল, না সত্যবাদী।

সাড়া পড়িয়া গেল। নবকৃষ্ণ আসিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন, সরকারী ডাক্তারখানার ডাক্তার বাবু, চৌধুরী বাড়ীর ম্যানেজার ও রিলিফ কমিটীর সেক্রেটারী অতুলপ্রসাদ, ব্যবসায়ী মধুপাল, মহাজন রামহরি পোদ্দার—আরও অনেক। রাজীবলোচন ও রতন তো আছেই।

নবকৃষ্ণের আগমনে হেড্ মাষ্টার কৃষ্ণদাসের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি আগাইয়া আসিলেন। দড়ি বাঁধা চশমাখানা কোটের পকেট হইতে বাহির করিয়া নাকে চাপাইলেন। দৃষ্টি তাহার কুঞ্চিত আরও তীব্র হইয়া উঠিল। নবকৃষ্ণের সঙ্গে আগত পেট্রোমাক্সের আলোতে তিনি নবকৃষ্ণকেই যেন দু-চোখ ভরিয়া দেখিতেছিলেন।

নবকৃষ্ণ হেড মাষ্টারকে দুইহাত তুলিয়া প্রণাম করিলেন, মাষ্টার মহাশয় যে! ছেলেদেরে নিয়ে কাল হাঁসখালিতে যাচ্ছেন তো? খুব ভোরে যেতে হবে কিন্তু।

হেড্ মাষ্টার শুষ্ককণ্ঠে উত্তর করিলেন, ছেলেরা আর কোথায়? তবে আমি যাব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু বড়বাবু!—বলিয়া তিনি থামিলেন। পূর্বে আর কখনও তিনি নিজের এক কালের ছাত্র নবকৃষ্ণকে বড়বাবু সম্বোধন করেন নাই।

নবকৃষ্ণ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলেন। হেড্ মাষ্টার ঢোক গিলিয়া কহিলেন, কিন্তু বড়বাবু! আজ কিছু না নিয়েই লোকগুলি সব ফিরে গেল। রাজীবকে কতোবার

পাঠালাম, সে বার বার ফিরে এসে বললে, তোমাকে পাওয়া গেল না।

নবকৃষ্ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, কি করব বলুন। সবই অদৃষ্ট বলতে হবে। আর তো কোন উপায় নেই। কিন্তু কাল থেকে তো তৈরী খাবারই সবাই পাবে মাষ্টার মশায়!

হেড্ মাষ্টারের ক্ষীণ কণ্ঠ এইবার হুঙ্কার দিয়া উঠিল—যেন সেই অনেক কাল আগেকার হেড্ মাষ্টারই,—উপায় নেই? বলতে বাধে না, এতোগুলি উপোসী লোক ফিরে গেল? কাল কেউ আসবে না, কেউ আসবে না—আমি মানা করে দেব, কেউ—

হেড্ মাষ্টার থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। সকলে হা হা করিয়া হেড্ মাষ্টারকে বাধা দিতে গেল। সত্যেশ আগাইয়া গিয়া কি বলিতে চাহিল। হেড্ মাষ্টার দ্রুত সেখান হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

নবকৃষ্ণ মৃদু হাসিয়া রাজীবকে আহ্বান করিলেন, বলিলেন, অভাবগ্রস্ত মানুষ। শোন, এক বস্তা চাল তাঁর বাড়ীতে এখনই পাঠিয়ে দাও। আর দেখ, কিছু ডাল, লবণ লঙ্কাও যেন নিয়ে যায়।

কালকার ভোজনাগার উদ্বোধনের উদ্যোগ আয়োজন সম্পর্কেই সকলে অবহিত হইলেন। সত্যেশ শৃঙ্খলা রক্ষা সম্পর্কে তাহার বক্তব্য বুঝাইয়া দিল। রিলিফ কমিটির সেক্রেটারী অতুলপ্রসাদ কালকার কার্য তালিকা বলিয়া গেলেন। ভোর আটটায় হাঁস

খালিতে মন্ত্রী ও ম্যাজিষ্ট্রেট অভ্যর্থনা ! . সাড়ে আটটায় চৌধুরী বাড়ীর গেটে অভ্যর্থনা ও তারপরই সেখানে মন্ত্রী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সহরাগত নেতাদের প্রাতরাশ। সাড়ে ন'টায় পূজোবাড়ীতে দাতব্য ভোজনাগারের চুল্লিতে মন্ত্রী কর্তৃক অগ্নি সংযোগ। দশটায় মণ্ডপে সভা ও বক্তৃতা। বারোটায় দুর্ভিক্ষচিত্র প্রদর্শন—মণিকা সেগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। একটায় মন্ত্রী, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্যদের লাঞ্চ। দুইটায় খাদ্য বিতরণ। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথম একজনকে পরিবেশন করিয়া বিতরণের উদ্বোধন করিবেন। দুইটা হইতে চারটা অভ্যাগতদের বিশ্রাম এবং দুঃস্থদের খাদ্য বিতরণ। চারটায় মন্ত্রী ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক গ্রামগুলি পরিদর্শন। সাতটায় প্রত্যাবর্তন ও চা-পান। সাড়ে আটটায় চৌধুরী বাড়ীতে মন্ত্রী, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও নেতাদের ডিনার।

নবকৃষ্ণ কর্মতালিকার খুঁটিনাটি বিশেষ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন, সকলেই আলোচনায় যোগদান করিলেন। সন্তোশও মাঝে মাঝে কথা বলিতেছিল, এমন সময় বাইরে একটা মোটরের আওয়াজ শুনা গেল।

নবকৃষ্ণের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে মৃদু চঞ্চলতা দেখা দিল। তিনি বলিলেন, নিশ্চয় কমল।

হাঁা, তাহার ছোট ভাই সর্ট সার্ট পরা কমল কৃষ্ণই।

কমলকৃষ্ণ দাদাকে দেখিয়া অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা ফেলিয়া দিয়া সার্টের পকেটে দুই হাত ঢুকাইয়া দাঁড়াইল।

নবকৃষ্ণ ব্যাকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, পাওয়া গেল কমল?

পাওয়া গেছে দাদা! কমলকৃষ্ণ মাথা ঘুরাইয়া পেছন দিকে নির্দেশ করিল। পেছনদিকে আসিয়া তখন দাঁড়াইয়াছে সাদা পাজামা পোষাক পরা কাঁচা পাকা দাড়িওয়ালা একটি লোক।

রতন বোধ হয় এই সংবাদ দানের জন্যই বাড়ীর দিকে ছুটিল। উপস্থিত সকলে একে অন্যের দিকে নির্বোধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

নবকৃষ্ণ কহিলেন, তুমি বাঁচালে কমল। কি যে ভাবনা-জানত মিঃ হ্যারিট—।

কমলকৃষ্ণ কহিল, যুদ্ধের বাজারে বাবুর্চি, খানসামা কি সহজে পাওয়া যায়, বরং কামান বন্দুকের ছড়াছড়ি। জজ-সাহেবের কাছথেকে শেষে ধার নিয়ে এলাম দু'দিনের জন্যে।

নবকৃষ্ণ কহিলেন, যাই হোক। তারপর তোমার ফিল্ম কোম্পানীর লোকেরা—আস্‌ছে তো?

কমলকৃষ্ণ কহিল, কালতো আর ভোজনাগার খোলা হচ্ছে না দাদা!

নবকৃষ্ণ দৃষ্টি কুঞ্চিত করিলেন, তার অর্থ?

অন্যান্য সকলের নির্বোধ দৃষ্টি এবার পরিপূর্ণ দুর্বোধ্যতায় অধিকতর বিস্ফারিত হইল।

কমলকৃষ্ণ কহিল, মন্ত্রীর স্ত্রীর ইনফ্লুয়েঞ্জা, তাই ভ্রমণ তালিকা বাতিল করে দিয়েছেন, তাই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটও পরের রববারের জন্যে একার্যটা স্থগিত রেখেছেন। তিনি অনুরোধ করেছেন, তুমি যেন ততদিন—

হুঁ, আমি তার চাকর, তার হুকুম আমাকে তামিল করতে হবে? আমার আর কাজ নেই?—নবকৃষ্ণ ক্রুদ্ধস্বরে হুংকার দিয়া উঠিলেন, সব……। তা হলে আর এটাকেই বা নিয়ে এলে কেন?

কমলকৃষ্ণ হাসিল। কহিল, বাবুর্চির কথা বলছ? ধার নেওয়া যে হয়েগেছিল। তা ছাড়া আমরাই কি আর দুদিন তার হাতের আস্বাদন গ্রহণ করতে পারি না?

সেদিকে—জনার্দনের বাড়ীতে উঠোনে আঁধারের মাঝে দাঁড়াইয়া আছে রূপসী আর নারাণ। দুজনই স্তব্ধ নীরব। যেন দুইটী অচল ছায়ামূর্তি।

তাদের একটু দূরে মাটীতে একখানা চাটাইয়ের উপর পড়িয়া আছে জনার্দন। জনার্দনের দেহ নিষ্প্রাণ—পাশের ছাড়াবাড়ীর চালাহীন ঘরে গলায় দড়ি বাঁধিয়া সে কখন ঝুলিয়া পড়িয়াছিল।

রূপসী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছে, ভূতের মত একাকী ঘুরিয়া সন্ধান করিয়াছে। তাহাকে পায় নাই। তার পর নারাণই আবিষ্কার করিয়াছে জনার্দনের প্রাণ হীন দেহ, নামাইয়া বহন করিয়া সেই লইয়া আসিয়াছে।

কিছুক্ষণ পর রূপসীই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, শোন।

নারাণ উত্তর করিল, কি, বল।

রূপসী সংযত কণ্ঠে কহিল, বাবার দেহটা যাহাতে পুরোপুরি দাহ হয়, কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকেনা, তারই ব্যবস্থা করতে হবে, যে কোন ভাবেই হোক। আর কিছু না পাওয়া যায়

দুঃসংবাদ

এই ঘরখানিতো আছে। আজ আমি তোমার ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করছি—তোমাকে বিশ্বাস করছি—

নারাণের দু চোখে জলধারা ছুটিল, সিক্তকণ্ঠে সে কহিল, বিশ্বাস কর রূপসী, আমি তাই করব। তুমি আমার উপর নির্ভর করতে পার।

রূপসী বাহিরের দিকে চাহিল। আঁধারের মাঝেও সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, এখনও সেই শকুনির দল মাথা উঁচু করিয়া চলাফেরা করিতেছে।

প্রত্যাবর্তন

তারাচরণ বহুকাল পরে গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার মনে হয়, সে অনেককাল। কিন্তু গাঁয়ের মুরুব্বি বৃদ্ধ ভূম্যধিকারী দত্তজা বলেন, এই সেদিন গেল আর এরইমধ্যে ফিরে এল? পথে যাহাদের সঙ্গেই তারাচরণের দেখা, তাহারাই এমন ভাব দেখাইল যেন তারাচরণ গাঁয়ে ফিরিয়া না আসিলেই তাহারা সন্তুষ্ট হইত।

ব্রজবিহারীর দোকান ঘরে তখন অনেকেই আসিয়া আসর জমাইয়াছে। তারাচরণের বাড়ীর পথে সেই দোকান। সে দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত করিল সুধাকান্ত রায়। চাহিয়াই সে চমকিয়া উঠিল, ফিস ফিস করিয়া বলিল, তারাচরণ!

তারাচরণ! সবাই যেন সহসা ভীত চকিত হইয়া উঠিল—তারাচরণ! এসে গেছে?

ব্রজবিহারী আড়চোখে চাহিয়া লইয়া উপস্থিত সকলকে ইঙ্গিতে আশ্বস্ত করিয়া ডাকিল, ওহে তারাচরণ! এই আসছ নাকি?

ইহাদের বিরূপ অভ্যর্থনা অনুভব করিতে তারাচরণের কষ্ট হয় না। সে অশিক্ষিত সত্য, কিন্তু বুদ্ধি তাহার তীক্ষ্ণ—আর অনুভূতি যদি প্রখর না হইবে, তাহা হইলে তারাচরণ কি করিয়া

অপরিচিত রুদ্ধদ্বারগৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়াও বুঝিতে পারে, গৃহের ভিতরে কে কোথায় শুইয়া আছে, কে জাগিয়া আছে আর ঘরের কোন পাশে কাহারা অসাড়ে ঘুমাইতেছে।

ব্রজবিহারীর আহ্বানে তারাচরণ কোন উত্তর না দিয়াই সে স্থান ত্যাগ করিল।

বাঁশ ঝাড় আর হিজল-জারুলের বনে সন্ধ্যার অন্ধকার এই বহুকাল পরেও তারাচরণের পরিচিত পথকে হারাইয়া দিতে পারে না। এই ছোট বনের পাশেই বৈষ্ণবদাসের পড়োবাড়ী, দিনের বেলাও মনে হয় লোকালয়ের বহুদূরে জনপ্রাণী বর্জিত এ এক ভীষণ স্থান, সেখানে চলাফেরা করে শুধু ভূত প্রেত আর দৈত্য দানব। তার পরই দলদামে জঙ্গলে ভরা একটা ছোট দিঘি—সেন দিঘি। দিঘি ছাড়াইয়াই আবার গ্রাম, পাশেই হারু চক্রবর্তীদের বাড়ী। দাস বাড়ী আর সেন দিঘির পথে সাধারণতঃ বিকাল হইতেই লোক চলেনা। পূবদিকের মাঠ ঘুরিয়া মুসলমানপাড়ার কাছ দিয়া লোক যাতায়াত করে—কিন্তু তারাচরণ এই পথ কোন কালেই বর্জন করে নাই, আজও করিল না।

হারু চক্রবর্তীর বাড়ীর পাশে নুইয়া-পড়া শেওড়া ঝোপের কাছে আসিয়া কাহার সঙ্গে যেন তারাচরণের ঠোকাঠুকি হইয়া গেল। লোকটি কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কে? কে হে?

আর কেহ নহে, হারু চক্রবর্তী নিজেই। তারাচরণ চিনিতে পারিল। অন্ধকারেই সে হাত বাড়াইল, পায়ের ধূলা লইল।

কহিল প্রণাম হই ঠাকুরকর্ত্তা, আমি তারাচরণ।

তারাচরণ? হারু চক্রবর্ত্তীর কণ্ঠে যেন ক্ষীণ কম্পিত আর্ত্তনাদ। অতি কষ্টে উচ্চারণ করিলেন, দুর্গা দুর্গা—তারাচরণ? তুমি কবে— এ—লে?

তারাচরণ হাসিল, ভয় নেই ঠাকুর কর্ত্তা, আমি প্রতিজ্ঞা করে এসেছি।

তারাচরণের প্রতিজ্ঞা? হারু চক্রবর্ত্তীর বাহিরে যাওয়া আর হইল না।

সারাগ্রামে এই আঁধারে-চলা তারাচরণের উপস্থিতিও সাড়া জাগাইয়া তুলিল। প্রতি গৃহেই সকলের মুখে এক কথা, তারাচরণ ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই তারাচরণ, যে মন্ত্রঃপূত ধূলোমুঠি ঘরের চারপাশে ছিটাইয়া দিলেই সে-বাড়ীর সবগুলি লোক অঘোরে ঘুমাইয়া পড়ে। সেই তারাচরণ যাহার হাতের মৃদু তালিতে রুদ্ধ আগল বদ্ধ কপাট আপনা আপনি খুলিয়া যায়। সেই তারাচরণ, সাপ যাহাকে ছোবল মারিতে আসিয়া ঝিমাইয়া পড়ে, শিলবৃষ্টি যাহার গায়ে পড়েনা, ভূতেরা আলো জ্বালাইয়া যাহাকে গভীর বনে বৈষ্ণবদাসের পড়োবাড়ীতে, সেন দিঘির উত্তর পাড়ের ঘন জঙ্গলেও পথ দেখায়।

তিন বছর পরে সেই তারাচরণ গাঁয়ে ফিরিয়া আসিয়াছে।

নিজের বাড়ীর পাশে আসিয়া তারাচরণ থমকিয়া দাঁড়াইল। কোথায় তাহার সেই দুখানি ঘর? পশ্চিমের ভিটায় যে ঘর খানি ছিল, তিন বছরেই সেই খরখানা পড়িয়া যাইবার কথা

অপরিচিত রুদ্ধদ্বারগৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়াও বুঝিতে পারে, গৃহের ভিতরে কে কোথায় শুইয়া আছে, কে জাগিয়া আছে আর ঘরের কোন পাশে কাহারা অসাড়ে ঘুমাইতেছে।

ব্রজবিহারীর আহ্বানে তারাচরণ কোন উত্তর না দিয়াই সে স্থান ত্যাগ করিল।

বাঁশ ঝাড় আর হিজল-জারুলের বনে সন্ধ্যার অন্ধকার এই বহুকাল পরেও তারাচরণের পরিচিত পথকে হারাইয়া দিতে পারে না। এই ছোট বনের পাশেই বৈষ্ণবদাসের পড়োবাড়ী, দিনের বেলাও মনে হয় লোকালয়ের বহুদূরে জনপ্রাণী বর্জিত এ এক ভীষণ স্থান, সেখানে চলাফেরা করে শুধু ভূত প্রেত আর দৈত্য দানব। তার পরই দলদামে জঙ্গলে ভরা একটা ছোট দিঘি—সেন দিঘি। দিঘি ছাড়াইয়াই আবার গ্রাম, পাশেই হারু চক্রবর্তীদের বাড়ী। দাস বাড়ী আর সেন দিঘির পথে সাধারণতঃ বিকাল হইতেই লোক চলেনা। পূবদিকের মাঠ ঘুরিয়া মুসলমানপাড়ার কাছ দিয়া লোক যাতায়াত করে—কিন্তু তারাচরণ এই পথ কোন কালেই বর্জন করে নাই, আজও করিল না।

হারু চক্রবর্তীর বাড়ীর পাশে নুইয়া-পড়া শেওড়া ঝোপের কাছে আসিয়া কাহার সঙ্গে যেন তারাচরণের ঠোকাঠুকি হইয়া গেল। লোকটি কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কে ? কে হে ?

আর কেহ নহে, হারু চক্রবর্তী নিজেই। তারাচরণ চিনিতে পারিল। অন্ধকারেই সে হাত বাড়াইল, পায়ের ধূলা লইল।

কহিল প্রণাম হই ঠাকুরকর্ত্তা, আমি তারাচরণ।

তারাচরণ ? হারু চক্রবর্ত্তীর কণ্ঠে যেন ক্ষীণ কম্পিত আর্ত্তনাদ। অতি কষ্টে উচ্চারণ করিলেন, দুর্গা দুর্গা—তারাচরণ ? তুমি কবে— এ—লে ?

তারাচরণ হাসিল, ভয় নেই ঠাকুর কর্ত্তা, আমি প্রতিজ্ঞা করে এসেছি।

তারাচরণের প্রতিজ্ঞা ? হারু চক্রবর্ত্তীর বাহিরে যাওয়া আর হইল না।

সারাগ্রামে এই আঁধারে-চলা তারাচরণের উপস্থিতিও সাড়া জাগাইয়া তুলিল। প্রতি গৃহেই সকলের মুখে এক কথা, তারাচরণ ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই তারাচরণ, যে মন্ত্রঃপূত ধূলোমুঠি ঘরের চারপাশে ছিটাইয়া দিলেই সে-বাড়ীর সবগুলি লোক অঘোরে ঘুমাইয়া পড়ে। সেই তারাচরণ যাহার হাতের মৃদু তালিতে রুদ্ধ আগল বদ্ধ কপাট আপনা আপনি খুলিয়া যায়। সেই তারাচরণ, সাপ যাহাকে ছোবল মারিতে আসিয়া ঝিমাইয়া পড়ে, শিলবৃষ্টি যাহার গায়ে পড়েনা, ভূতেরা আলো জ্বালাইয়া যাহাকে গভীর বনে বৈষ্ণবদাসের পড়োবাড়ীতে, সেন দিঘির উত্তর পাড়ের ঘন জঙ্গলেও পথ দেখায়।

তিন বছর পরে সেই তারাচরণ গাঁয়ে ফিরিয়া আসিয়াছে।

নিজের বাড়ীর পাশে আসিয়া তারাচরণ থমকিয়া দাঁড়াইল। কোথায় তাহার সেই দুখানি ঘর ? পশ্চিমের ভিটায় যে ঘর খানি ছিল, তিন বছরেই সেই ঘরখানা পড়িয়া যাইবার কথা

নয় তো! চালে ছিল শক্ত টিনের ছানি, শক্ত বাঁশের খুঁটাতে বাঁধা ঘর। বাইরের চালা ঘরখানিতে একটা গরু থাকিত, সেও বাড়ী ছাড়িয়াছে? মোক্ষদা তার সঙ্গে ঘর করিয়াছে আটটী বছর, দু'চার দিনের ঘরকন্না নয়। তা'ছাড়া অভাব যাহাতে না হয় তাহার সন্ধানও তো তারাচরণ দিয়াছিল মোক্ষদা কে? বুদ্ধিমতী মোক্ষদা।

তারাচরণ চাহিয়া দেখিল ভাল করিয়া, এই তো বাড়ীর সম্মুখে সেই পানা ভর্তি ডোবাটী। তার এক দিকে সেই আম গাছটী—অনেক কালের আমগাছ, অনেকগুলি বড় বড় ডাল পালা মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নিশ্চয়ই তাহার বাড়ী তারা চরণের ভুল হইবার নয়। তবে—?

সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াই আবার পথ চলিতে লাগিল। এইবার সে তাহার জমিদার দত্তবাড়ীর পথ ধরিল—তারপর মনে পড়িল বৃদ্ধ দত্ত মহাশয় সন্ধ্যা হইলেই তাঁহার আখড়া বাড়ীতে চলিয়া যান, সেখানেই রাত্রি যাপন করেন। অনেক কালের তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত আখড়া, আর সেখানে আছেন রাধা মাধবের বিগ্রহ এবং বৈষ্ণবী রাইকামিনী ও বিষ্ণু প্রিয়া। রাই কামিনী বৃদ্ধ হইয়া যাওয়ার পর বিগ্রহ সেবা আর দত্তজার ভজন সাধনে ব্যাঘাত ঘটিতে থাকায় তিন মাইল দূরের পলাশপুর হইতে আচার্যিদের বিধবা বউ বিষ্ণুপ্রিয়াকে এক গভীর রাত্রিতে দত্তজার আদেশে তারাচরণই হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। ঘুমন্ত বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাঁধে তুলিয়া তাহার সেই ছুটিয়া

চলা, সঙ্গে পাহারাদার, লাঠিয়লের দল, পথে বিষ্ণুপ্রিয়ার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন---তারপর মামলা মোকদ্দমা, বিষ্ণুপ্রিয়ার ভেক গ্রহণ, কতো কি, এখনও তারাচরণের স্পষ্ট মনে পড়ে। দত্তজা তারাচরণকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, সেও বিশ্বস্তের মতোই তাহার আদেশ পালন করিয়াছে।

রাধামাধবের আখড়ায় তখন সন্ধ্যারতি শেষ হইয়াছে, যাহারা আরতিতে নিত্যকার আগন্তুক, তাহারা এখন দত্তজাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছে। বিষ্ণুপ্রিয়া কপালে তিলক কাটিয়া ভাবাবেগে মুদ্রিত চোখে মৃদু হাসিতে মুখখানিকে উদ্ভাসিত করিয়া এক পাশে স্বতন্ত্র আসনে বসিয়া আছে। দত্তজা চোখে পুরু চশমা আঁটিয়া ভাগবত খুলিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। একটা পিল-সুজে রেড়ীর তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছে।

তারাচরণ আঁধারে দাঁড়াইয়াই ডাকিল, কর্তা।

সকলে চমকিয়া উঠিল, দত্তজার ব্যাখ্যা বন্ধ হইল। বোষ্টমী বিষ্ণু প্রিয়ার মুদ্রিত চোখ দুটীও উম্মিলিত হইল।

দত্তজা চোখের চশমা খুলিয়া হাঁক দিলেন, কে, কে, এখানে?

আমি তারাচরণ, কর্তা,—বলিয়া তারাচরণ আগাইয়া গেল।

সেখানকার সমাবেশের কাহারও কণ্ঠে তখন কোন কথা নাই, সবাই নির্বাক, নিস্পন্দ।

দত্তজার কণ্ঠ প্রথম কিছুটা কম্পিত হইল, তারপরই তিনি আত্মসম্বরণ করিলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন, রাধামাধব! রাধামাধব! তারপর তারা চরণ, তুমি কবে এলে?

তারাচরণ ভূমিতে পড়িয়া বিগ্রহকে এবং দত্তজাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, এই এলাম কর্তা। কিন্তু কর্তা, আমার ঘরবাড়ী—

দত্তজা কহিলেন, সংসারে কিছুই সত্য নয় তারাচরণ—

আমার মোক্ষদা! তারাচরণের কণ্ঠ তীক্ষ্ণ তীব্র।

রাধামাধবই জানেন। দত্তজা কহিলেন, তুমি বস তারাচরণ। অধীর হয়োনা। কতো কি দেশে ঘটে গেল, গা'ছেড়েই কতো লোক গেল। যুদ্ধের হিড়িকে রাধামাধবের লীলায় কত কিছু উলট পালট হল। ম্যালেরিয়া, মহামারী—

তারাচরণ কহিল, কিছু কিছু আমিও শুনেছি কর্তা, কিন্তু মোক্ষদা কেন যাবে, ঘরবাড়ীই ভাঙ্গবে কেন?

দত্তজা এইবার হাসিলেন, এসব তুমি বুঝবে না তারাচরণ, শোনে বুঝা যায়না। মোক্ষদা গেলোত গেলই—একদিন ভোরে উঠে শোনা গেল, মোক্ষদা নেই—তারপর ঘরবাড়ী। আমি তো এই দুর্দ্দিনে সব ফেলে রাখতে পারিনা তারাচরণ?

তারাচরণের কণ্ঠে একটী মাত্র শব্দই উচ্চারিত হইল, আমি প্রতিজ্ঞা করে এসেছি কর্তা! তারপর সে ফিরিয়া চলিল।

দত্তজা হঠাৎ শিহরিয়া উঠিলেন, ডাকিলেন, যাস্‌নে তারাচরণ, রাতে এখানে প্রসাদ খেয়ে যা—আর—

তারাচরণ দাঁড়াইল না।

আখড়ার বাহিরে আসিতেই গুলঞ্চ গাছটীর পাশ হইতে কে একজন মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, শোন।

তারাচরণ দাঁড়াইল। ডাকিয়াছিল রাইকামিনী। সে আসিয়া আবার ডাকিল, ও তারাচর।!

তারাচরণ আঁধারেও চিনিতে পারিল তাহাদের বাল্যকালের রূপসী বোষ্টমী বর্তমানে প্রৌঢ়া ভগ্নদেহধারিনী সেই রাইকামিনী। রাইকামিনীর মুখে বিদ্রুপের হাসি, কণ্ঠে আঘাতের তীব্রতা।

রাইকামিনী কহিল, তোমার মোক্ষদা কই তারাচরণ? পেলে না?

তারাচরণ এইবার কথা কহিল না। তা'তে তোমার কি ঠাক্‌রুণ।

রাইকামিনী মুখ বাঁকাইল, দুঃখ তারাচরণ, দুঃখ। তুমি যেমন একদিন চুরি করে এক মাগীকে এনে এখানে বোষ্টমী বানিয়েছিলে, তেমনি তোমার মোক্ষদাকে কারা চুরি করে নিয়ে গেছে। তাই সেই দুঃখের কথা বল্‌ছিলাম।

চুরী করে নিয়ে গেছে? তারাচরণের কণ্ঠ গর্জিয়া উঠিল। তারপর সে চাপাগলায় বিড় বিড় করিয়া বলিল, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছি।

রাইকামিনী চাপা কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। অনেক দূর হইতেও যেন তারাচরণ শুনিতেছিল, দূরে রাইকামিনীর সেই বিদ্রুপ তীক্ষ্ণ হাসি তীক্ষ্ণ শরের মত তাহাকেই বিদ্ধ করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। তারাচরণ শূন্য ভিটার একপাশে গায়ের চাদরখানা বিছাইয়া

শুইয়াছিল। এই তার ভিটা, এখানেই সে ও মোক্ষদা থাকিত। এখন আছে উপরে উন্মুক্ত কাল আকাশ, আর নীচে কঠিন পৃথিবীর মাটী। তারই ঘর হইতে মোক্ষদা চুরি গিয়াছে, তারাচরণের মোক্ষদা। তারাচরণের স্ত্রী ও চুরি গেল?

বিড়ির পর বিড়ি তারাচরণ ফুঁকিয়া চলে, চোখে তাহার ঘুম নাই। গত তিন বছরে রাত্রের ঘুমে সে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। নইলে আগে গভীর রাত্রে তারাচরণ ঘুমাইয়া আছে এই অপবাদ কেহই তাহাকে দিত না। তখনই তাহার ভ্রমণ কাল। সন্ধ্যায়ই সে জাগিয়া উঠিত। রাত্রিতে তাহার কর্ম্মোন্মাদনা জাগিত। সে বাহির হইয়া পড়িত পথে পথে। কাজ কর্মের সুবিধা না হইলে সে পথে পথে ঘুরিয়া বন বাদাড়ে বসিয়া বিড়ি ফুঁকিয়াও রাত্রি কাটাইয়া দিত। আজ তাহার হাসি ও পাইল। তারাচরণ গাঁয়ে ফিরিয়াছে এবং নিজের ভিটায় এই গভীর রাত্রে শুইয়া পড়িয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছে আর গ্রামবাসী নির্বিঘ্নে নিদ্রা যাইতেছে?

কখন ক্লান্তি ও অবসাদ তাহার উত্তেজিত দেহকে মস্তিষ্ককে স্তিমিত করিয়া আনিয়াছিল, চোখের পাতাদুটি বুঝিয়া আসিতেছিল। কি একটা দূরাগত শব্দে তারাচরণ আবার পূর্ণ অনুভূতি ফিরিয়া পাইল। নিশ্চয়ই মানুষের পায়ের শব্দ। তারাচরণ আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল, তাহার শ্রবণ শক্তি এখনও তেমনি তীক্ষ্ণ, বোধশক্তি তেমনি প্রবল আছে। অন্ধকারে তাহার চোখ দু'টী জ্বলিয়া উঠিল। কে আসে এদিকে, এ শূন্য ভিটায়?

এ যদি দত্তজা হয়? দত্তজা কেন আসিবে? যদি মোক্ষদা হয়—হয়ত দত্তজাই মোক্ষদাকে কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছে, সে হয়তো সংবাদ পাইয়াই পলাইয়া আসিয়াছে? কিন্তু তাই বা কি করিয়া সম্ভব? অধীর তারাচরণ গুঁড়ি মারিয়া আগাইয়া চলিল, নিঃশব্দ সন্তর্পিত তাহার গতি।

দত্তজা নয়, মেয়েলোকও কেহ নয়। আধারেও তারাচরণ ছায়া দেখিয়া বুঝিতে পারে পুরুষ না নারী, বৃদ্ধ না যুবক। এ একটি যুবক, তবে কে! যে আসিতেছিল, সেও খুব সন্তর্পনে আসিতেছিল। হঠাৎ তারাচরণের মাথায় বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। ওই আমড়াগাছটী, তারই তলায় তো সে অনেকগুলি টাকা মাটীর হাড়িতে করিয়া পুরিয়া রাখিয়াছিল। মোক্ষদা হয়তো তুলিবার সুযোগ পায় নাই। অন্য কেহ সন্ধান পাইয়াছে আর আজ তারাচরণ ফিরিয়া আসিয়াছে জানিয়া তাড়াতাড়ি সেগুলি তুলিয়া সরাইয়া ফেলিবার জন্যই তাহার এই নৈশ অভিযান।

তারাচরণ বাঘের মতো সহসা সেই লোকটার উপর লাফাইয়া পড়িল। তাহার মাথায় খুন চাপিয়াছে। খুন সে কখনো করে নাই, করিতে গিয়া থামিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আজ সে করিবে। তাহার হাতে এখনো শক্তি আছে, সাঁড়াশীর মতো হাত দুটী। সে লোকটার গলা সাড়াশী দিয়া চাপিয়া ধরিল তারপরই তাহার মনে হইল, সে যে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে। তৎক্ষণাৎ যেন মন্ত্র বলে তাহার হাত দুটীর বন্ধন শিথিল হইয়া

পড়িল। সে শিকার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

লোকটী কিছুক্ষণ হাঁফাইয়া গা ঝাড়িয়া উঠিয়া বসিল, আমাকে চিনতে পারলে না তারাচরণ। আমি ছিরু। তোমারই খোঁজে আস্‌ছিলাম। জানতাম তোমাকে এখানেই পাব।

ছিরু তারাচরণেরই সাগরেদ্ বলা যাইতে পারে। ছিরুকে তারাচরণ ভুলিয়াছিল, কিন্তু ছিরু তাহাকে ভুলে নাই।

ছিরুর বাড়ীতে এই রাত্রিশেষে প্রবেশ করিয়া তারাচরণ দেখিল, তাহার বাড়ীর ভোল ফিরিয়াছে। সেই ছোট ভাঙ্গা এক চালায় আর ছিরু বাস করে না, তাহার স্থানে দু'চালা খড়ের ঘর। বাড়ীখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তারাচরণ বুঝিতে পারে ঘরের ভিতর একটা মেয়েলোকও অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। ছিরু ইতিমধ্যেই বিয়ে করিয়াছে ? না এখানেই লোকাইয়া আছে মোক্ষদা ? তারাচরণের রক্ত সহসা মাথায় চড়িয়া যায়। সে বলে, ঘরে কে রে ছিরু ?

ছিরু হাসে। বৌ, আমার বৌ তারাদা। দেখ্‌বে তো।

ছিরুর বৌটী সুন্দরই, বেশ গোলগাল ছোট্ট মেয়ে। তবে মোক্ষদার মত নয়। তারাচরণকে খাইতে দেয় ডালভাত আর গুড় তেঁতুল। এতো রাত্রে তারাচরণ অনেক কাল আগে খাইত।

ছিরু তাঁহার কাহিনী বলিয়া যায়। সে ধনীরামের আড়তের কর্মচারী। তারাচরনের ব্যবসা ছিরু ছাড়িয়া দিয়াছে। ধনীরাম তাহাকে কম দেয় না। মস্তবড় ফলাও ব্যবসা তাহার। সে এই অঞ্চলের কাপড় যোগায়, ডাল, আটা, ময়দা, চিনিও।

ছিরু তাহার মজুরদের সর্দারী করে। রাত্রে গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া কাপড়ের গাঁট, আটা, ময়দা, চিনির বস্তা গাঁয়ের কয়েকটী বাড়ীর ধানের গুদামে নিয়া লুকাইয়া রাখিতে হয়। আবার সেগুলি হয়ত বা সহরে, বা অন্য বাজারে রাতেই চালান যায়। এখানেও অনেক ছোটখাট দোকানদার আছে। ছিরু না হইলে রাতের আঁধারে এই মাল চালান দেওয়া আর কারো বুদ্ধিতে চলিত না। তাই ধনীরামের আড়তে ছিরুর বড় খাতির। অবশ্য ধানচালের ব্যবসায় হারুচক্রবর্তীর বি, এ, পাশ ছেলে সলিল ধনীরামের দক্ষিণ হস্ত। শুনা যায় পনর টাকা মণ দরে চাল কিনিয়া পনর টাকা কন্ট্রোলেই সরকারকে সরবরাহ করিয়া সলিল ধনীরামকে এক বছরে তিন লাখ টাকা লাভ করাইয়া দিয়াছে। তারাচরণ শুনে আর ভাবে, এ যেন ভোজবাজী চলিয়াছে। কি করিয়া কি হয় বুঝা যায় না। কত লোক উজাড় হইয়া গিয়াছে, কতোলোক ফাঁপিয়া উঠিয়াছে, কতোলোক গাঁ ছাড়িয়াছে, কতো লোক নূতন আসিয়াছে দালান কোটা তৈরী করিয়াছে। যুদ্ধের এ ভোজ বাজী।

তারাচরণকে দূরে রাখিয়া এতো কাণ্ডই ঘটিয়া গেল?

আর মোক্ষদা?

ছিরু বলে, গাঁয়ে সভা করে ঠিক হল তারাদা, তোমাকে আর এ গাঁয়ে থাকতে দেওয়া হবে না। তারপর—মোক্ষাদকেও। কি করে যে কোথায় কারা তাকে নিয়ে গেল? কেউ বলে এখন সে সহরে আছে। দত্তজা এর মধ্যে নিশ্চয় আছেন।

সহরে? তারাচরণ উঠিয়া দাঁড়ায়। সহরে মোক্ষদা? তাহলে সেখানে সে—

তারাচরণের সমস্ত দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। কিসের লোভে মোক্ষদা সহরে বাস করিতেছে? তাহার বাড়ীর আমড়া গাছের তলায় তো কম টাকা লুকানো ছিল না?

প্রায় সারাটী দিন তারাচরণ ছিরুর ঘরের একটি কোঠায় কাঁথা মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকে। দিনের আলোয় গাঁয়ের লোকের সম্মুখে যাইতে এই তাহাকে প্রথম লজ্জায় কুণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে। সবাই তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিবে, এই— তো, তারাচরণ, তার বউ মোক্ষদাকে কারা চুরি করে নিয়েছে।

উত্তর সে দিতে পারে গাঁয়ের লোককে—দস্তুরা কেও। সে এখনও দুর্ব্বল নয়, সাহসের তার অভাব নাই কিন্তু সে যে তার প্রবাস জীবনের গুরু হরিশদার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে জীবনে অপকর্ম্ম আর সে করিবে না। কতো প্রতিজ্ঞাই সে জীবনে করিয়াছে, পরমুহূর্ত্তে কুটিল হাস্যে তাহাকে উপেক্ষাও করিয়াছে। কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা সে উপেক্ষা করিতে পারে না কেন?

হরিশদা ছোট খাটো ক্ষীণ দেহ মানুষটি কিন্তু তেজে গরিমায় দীপ্ত, উজ্বল। সেই হরিশদাকে শাস্তি দিবার ষড়যন্ত্রে সেও সাক্ষ্য দিয়াছিল—মিথ্যা সাক্ষ্য। হরিশদা শাস্তি ভোগ করিয়া তারাচরণকে কাছে ডাকিয়া তাহার পিঠে হাত রাখিয়া অশ্রু ভরা চোখে শুধু বলিয়াছিলেন, মিছে কথা বলে এলে তারাচরণ?

ছোট্ট একটুখানি কথা, তারাচরণের হৃদয়ে গিয়া আঘাত করিয়াছিল! সে এই জীবনে প্রথম অনুভব করিতে পারিয়াছিল, তাহারও হৃদয় বলিয়া একটা বস্তু আছে।

তার পরই দিনের পর দিন হরিশদার কাছে তারাচরণ অনেক কিছু শুনিয়াছে। এই দেশের কথা। মানুষের কথা, জীবনের কথা, সত্যের কথা, ন্যায়ের কথা—শুনিয়াছে, কিছু বা বুঝিয়াছে কিছু বা বুঝিতে পারে নাই। শুধু একটা কথা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে এতোকাল যাহা সে করিয়াছে, তাহা কতো ভুল আর ইচ্ছা করিলে সেও মানুষ হইতে পারে, ভদ্র হইতে পারে। তারাচরণ ভদ্র হইবে?

সে হরিশদার পা' ছুইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে, প্রবাস-জীবনের শেষ দিনটীতে আর কোন অপকর্ম্ম সে করিবে না হরিশদার চোখ হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়াছে তারাচরণের মাথায়। তারাচরণ কাঁদিয়া মাটী ভিজাইয়াছে।

আজ গাঁয়ে ফিরিয়া আসিয়া, নিজের বসত ভিটা ও স্ত্রী মোক্ষদাকে হারাইয়া তারাচরণের মনে হইতেছে হরিশদাকে কাছে পাইলে সে জিজ্ঞাসা করিত, কি করিয়া এই গাঁয়ে থাকিয়া সে মানুষ হইবে?

অপরাহ্নে কর্ম্ম স্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়া ছিরু তারাচরণকে বলিল, ধনীরামকে বললাম তোমার কথা তারাদা। সে বললে আজই যেন রাত্রে দেখা কর তার সঙ্গে। তোমার জন্য তার হাতে ভাল কাজ আছে। বলিয়া ছিরু হাসিতে লাগিল।

তারাচরণ জিজ্ঞাসা করিল, কি কাজ রে?

ছিরু বলিল, কি জানি তারাদা। হয়তো সহর থেকে মাল পত্তর আনানোর কাজে তোমাকে লাগাবে।

তারাচরণ প্রশ্ন করিল, সেটা এমন কি কঠিন কাজ ছিরু।

ছিরু হাসিতে ফাটিয়া পড়িল, কঠিন নয়? অনেক ঘাট পেরিয়ে, অনেক হাত কাটিয়ে অনেক লোকের চোখে ধূলো দিয়ে তবে মাল নিয়ে আসতে হয় তারাদা।

তারাচরণ কহিল, এ যদি করতে হয়, তবে নিজেই ব্যবসা করিনা কেন, চাকরী করব কেন?

ছিরু কহিল, টাকা কোথায় পাব তুমি আমি?

কেন? টাকাতো—তারাচরণ বলিতে যাইতেছিল, আমড়া গাছ তলায় তাহার এক হাড়ি টাকা। সহসা থামিয়া গেল।

সন্ধ্যার পরই ছিরুর বাড়ীতে গ্রামের চৌকিদার হারাণের হাঁক শুনাগেল, ওহে ছিরু, ও ছিরিচরণ! বাড়ী আছ নাকি?

ছিরু সাড়া দিতেই চৌকিদার কহিল, তারাচরণ তো তোমার বাড়ীতেই আছে ছিরিচরণ! দত্ত বাড়ীতে দারোগাবাবু এসেছেন, তার তলব আছে।

দারোগাবাবুর তলব? ছিরু একটু কাঁপিয়া উঠিল। ঘরের ভিতর হইতে তারাচরণ কহিল, ফিস্ ফিস্ করিয়া, চুপ, বলিস্‌নে।

ছিরু ঢোক গিলিয়া কহিল, হারাণদা ও তো বেরিয়ে গেছে। তা' আমি খুঁজে তাকে এখনি পাঠাচ্ছি।

হারাণ একটু হাসিল, না গেলে কি হবে, তারাচরণের নিশ্চয়ই জানা আছে ছিরু।

হারাণ চলিয়া গেল, ছিরুকে আশ্বাস দিয়া তারাচরণ কহিল আমি'যাব ছিরু, তুই ভয় করিসনে—শুধু ওর সঙ্গে গেলাম না।

দত্ত বাড়ীর বৈঠকখানায় আজ সমারোহ। দারোগাবাবু আসিয়াছেন, জমাদার সাহেব, দু'জন কনেষ্টবল সঙ্গে আসিয়াছেন। দত্তজার রাধামাধবের আরতিতে উপস্থিতি ও ভাগবত ব্যাখ্যা আজ আর হইয়া উঠিবে না। পরম বৈষ্ণব দত্তজার গৃহে রাজ-প্রতিনিধির শুভাগমন উপলক্ষে একটা খাসি আনীত হইয়াছে, কেরোসিনের লাইসেন্সধারী রূপনাথ সাহা মহাশয় বিষ্ণুকে নিবেদন করিবার জন্য খাসিটিকে পাঠাইয়াছেন। ধনীরাম পাঠাইয়াছেন একটীন ঘি, শাক সব্জীও এক ঝুড়ি আসিয়াছে। দত্তজা অপরাহ্ণেই পুকুরে জাল ফেলিয়া একটা বড় মাছ তুলাইয়াছেন।

গ্রামের কয়েকজন দারোগাবাবুর কাছে নানা অভিযোগ করিতেছেন, কেরোসিন তাহারা বরাদ্দ মতোও পান না। বরাদ্দে তো দশদিন ও ঘরের আঁধার দূর হয় না, তার উপর।

দারোগা বাবু রূপনাথ সাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, সাহা মহাশয় চাহিলেন উঠানে বাঁধা খাসিটির দিকে, খাসিটি প্যাঁ প্যাঁ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। সাহা বলিলেন, সে দিনও সাপ্লাই সুপারিন্‌টেন্ সব দেখে গেছেন, দারোগাবাবু। এবার তো পনর টিনের তলায়ই ফুটো, আমি কি করি বলুন? পথেই সব—

দারোগা বাবু বলিলেন, কাল সকালে আপনার ওখানে যাব সাহা মশায়। তাহার মুখ বাঁকা হাসিতে কুঞ্চিত হইল।

ধনীরামের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনিয়া দারোগাবাবু হাই তুলিতে লাগিলেন।

দত্তজা বলিলেন, আমরা যে এটুকুও পাচ্ছি, এখনও প্রদীপ জ্বালাচ্ছি, নূন খাচ্ছি, কাপড় পরছি, মহামান্য সরকারকে ধন্যবাদ দাও। আর রাধামাধবকে! রাধামাধবই সত্য।

দারোগাবাবু এযুদ্ধে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে কোন কোন দেশের লোক কতো অভাবের মধ্যে দুঃখ দৈন্য ও অত্যাচারের মধ্যে দিন কাটাইতেছে তাহার বর্ণনা দিতে লাগিলেন।

ধনীরামের গোমস্তা গঙ্গারাম বাবু গাঁয়ের একদল যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। তাহারা ব্যবসায়ের পথে বড় উৎপাত সৃষ্টি করিতেছে। এরকম করিলে এ অঞ্চলের লোকের জন্য জিনিষপত্র আমদানী করা বন্ধ করিতে হইবে।

দারোগা বাবু কহিলেন, ধৈর্য্য ধরুন মশায়। ওদের বেশী ঘাটাবেনও না। আর যদি সত্যি কোন কেস থাকে, বল্‌বেন।

তারপরই তারাচরণের কথা উঠিল। সেই দুর্দান্ত দাগী তারাচরণ আবার গাঁয়ে ফিরিয়া আসিয়াছে। আসিয়াই কাল সারাটী রাত বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, শুধু সবাই সতর্ক ছিল বলিয়া।

অনেকেই সাক্ষ্য দিল, কে কোথায় কি অবস্থায় কাল রাত্তে

তারাচরণকে পাইয়াছে। তারাচরণ তখন আসিয়া একটু দূরে আঁধারের মাঝে আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল, এতোগুলি লোকের সঙ্গে তো কাল রাতে তার দেখা হয় নাই?

দত্তজা বলিলেন, এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে দারোগা বাবু, নইলে গাঁয়ে বাস করা ভার হয়ে উঠবে। পাকা চোর আর গোঁয়ার খুনে ওই তারাচরণ। রাধামাধবের যে কি ইচ্ছা।

তারাচরণের চোখ দু'টী জ্বলিয়া উঠিল। দত্তজা তাহাকে চোর বলেন? অথচ দত্তজার আদেশেই সে একদিন বিষ্ণু-প্রিয়াকে চুরি করিয়াছিল, আর তার মোক্ষদাকে—

দারোগা বাবু কহিলেন, আসুক আগে তারাচরণ তারপর দেখবেন—মেরে চট্ করে দিয়ে যাব। কোন ভয় নেই।

তারাচরণ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তবে কি তাহাকে এখানেই মার খোর করিবার জন্য দারোগাকে আটকাইয়া রাখিবে?

দত্তজা কহিলেন, আপনার ভরসায়ই আমরা আছি দারোগা বাবু।

সকলেই দত্তজাকে সমর্থন করিল।

দারোগা আর একটি সিগারেট ধরাইয়া জোরে টান দিয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িলেন, তারপর বলিলেন, হবে—হবে—হবে—। সত্যি চারদিকে চোর ডাকাতের উপদ্রব বড় বেড়েছে।

তারাচরণ যেমন আসিয়াছিল, তেমনি আঁধারের মাঝে ডুবিয়া গেল।

এক বাড়ী হইতে একখানি খুন্তি সংগ্রহ করিয়া নৈশ অভিযানে চলিয়াছে তারাচরণ। সে আজ এ গাঁয়ে দেখাইবে, তারাচরণ এখনও মরে নাই, সে বাঁচিয়া আছে। প্রতিজ্ঞা সে পালন করিবে না। কেন, কোথায় হরিশদার আদর্শের লোক, সে তো একটিও দেখিতে পায় না? হরিশদা পাগল। আঁধারে দাঁত মেলিয়া তারাচরণ হাসিয়া উঠে।

সে আঁধারে আঁধারে বনবাদাড়ে পথ চলিয়া চলিয়া রূপনাথ সাহার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। পাকা বাড়ী, এবাড়ীতে খুন্তি চলিবেনা, অন্য অস্ত্রের প্রয়োজন। একটি ঘরের ভিতরে এখনও আলো জ্বলিতেছে, জানালার ফাঁক দিয়া দেখা যায়। আর সারা বাড়ী নিস্তব্ধ।

তারাচরণ জানালায় গিয়া কান পাতিয়া দাঁড়ায়, ভিতরে দুইটি লোক কথা বলিতেছে, একজন রূপনাথ—আর একজন অপরিচিত, অন্ততঃ তারাচরণের কাছে। রূপনাথ লোকটীকে নন্দী বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। হিসাবের খাতা কি করিয়া কাল দারোগা বাবুকে দেখাইতে হইবে, আর কি প্রক্রিয়া করিতে হইবে, গুদামের কেরোসিনের টিনগুলি কি করিয়া সাজাইতে হইবে তাহারই শলাপরামর্শ হইতেছিল।

সে পরামর্শ শেষ হইলে রূপনাথ গোরুর ব্যবসায়ের কথা

তুলিলেন। কনট্রাক্ট নিয়াছে রাইমুদ্দি মহাজন, টাকা যোগাই-বেন তিনি—৫০—৫০ ভাগ।

তারাচরণ জিভ কাটিয়া নামিয়া আসিল।

সে গিয়া রাধামাধবের আখড়ায় উপস্থিত হইল, সে বাড়ীই তাহার প্রধান লক্ষ্যস্থল।

আখড়া বাড়ী স্তব্ধ নিঝুম। কোন সাড়া নাই। তারাচরণ কিছুক্ষণ একটি ঝোপের আড়ালে থমকিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে কে একজন সন্তর্পনে পশ্চিমদিকের ঘরের বারান্দা হইতে নামিয়া আসিল! সাদা পোষাক ধব্ ধব্ করিতেছিল। তাহার পেছনে দূরে একটী মেয়েলোক, বোষ্টমী বিষ্ণুপ্রিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া চকিতে গিয়া আবার গৃহে প্রবেশ করিল। সাদা পোষাকওয়ালা লোকটী সলিল, হারু চক্রবর্ত্তীর ছেলে। তারাচরণ হাসিল। বৃদ্ধ দত্তজার অনুপস্থিতিতে যুবক সলিল আখড়ার মোহন্তগিরি করিবে, তারই মহড়া চলিয়াছে?

সেই ঝোপেই অনেকক্ষণ তারাচরণ অপেক্ষা করিল, বিষ্ণু-প্রিয়ার ঘুমাইয়া পড়িবার অপেক্ষা। তারপর ঘরের পেছন-দিকে গিয়া একটী জায়গা বাছিয়া লইয়া সে খুন্তি চালাইল।

সিঁদ দিয়া ঘরে ঢুকিয়া সে সামনের দরজাটি খুলিয়া রাখিল—বিষ্ণুপ্রিয়াকে চুরি করিয়া লইয়াই আজ সে পলাইবে। তাহার বুকের রক্ত ছল.ছল করিতে লাগিল, চোখ দুটি জ্বল্ জ্বল্।

বিছানায় বিষ্ণুপ্রিয়া ঘুমাইতেছে। তাহার নিঃশ্বাসের শব্দ

তারাচরণ শুনিতে পায়। তারাচরণ টেঁক হইতে দেশলাই বাহির করিয়া একটি কাঠি জ্বালে, বিষ্ণুপ্রিয়াকে সে দেখিয়া লইবে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে প্রশান্তি, দুই ঠোঁটে মৃদু হাসির আভাষ তৃপ্তির আবেশ মাখা। তারাচরণ বুঝিতে পারে বিষ্ণুপ্রিয়া খুব সুখী। তাহার সুন্দর ঘুমন্ত মুখখানি মোক্ষদার মতই সুন্দর দেখাইতেছে। মোক্ষদাও এমনই মাঝে মাঝে আখড়ায় গিয়া নাকে সরু তিলক কাটিয়া আসিত। এমনই করিয়া ঘুমাইয়াও হাসিত।

তারাচরণের বুক ছ্যাৎ করিয়া উঠে। তাহার মোক্ষদাকে কারা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।

তারাচরণ তড়িৎবেগে খোলা দরজা দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। সে ছুটিয়া চলে তাহারই শূন্য ভিটার দিকে। সে আর এগাঁয়ে থাকিবে না, চলিয়া যাইবে, যে দিকে দু'চোখ যায়। কিন্তু যাইবার আগে সেই আমড়া গাছের নীচের টাকাগুলি? হরিশদা বলিয়াছিলেন,—হায়, হরিশদা! তুমি কিছুই জান না। তুমি একটা আস্ত পাগল!

উন্মাদের ন্যায় তারাচরণ আমড়াগাছের তলাটা খুঁড়িতেছে। মাটীর স্তূপ জমিয়া গেছে, খোঁড়া তাহার শেষ হয় না। খুঁড়িতে শুধু মাটীই উঠিতেছে, কোথায় টাকা? মোক্ষদা যেমন নাই,

টাকাও তেমনি নাই। কিন্তু টাকার খোঁজ জানিত এক মোক্ষদা!

মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে কখন যে তারাচরণ অবসন্ন দেহে সেইখানেই নেতাইয়া পড়িয়াছিল বলিতে পারে না। যখন তাহার জ্ঞান হইল, তখন রোদ উঠিয়াছে আর দারোগবাবু, জমাদার কনেষ্টবল একটা জনতা সহ তাহাকে ঘেরাও করিয়া আছেন।

আবার তারাচরণ লোহার গেটের পর কাঠের গেটের ছোট দরজা দিয়া জেলখানায় প্রবেশ করিল, এক সন্ধ্যায়।

মাত্র কয়দিন পূর্বে এই জেলখানা হইতেই রাজবন্দি হরীশদার কাছে দুষ্কর্ম না করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া সে তিন বৎসর জেল খাটিয়া বাহিরে গিয়াছিল।

তাহার উপস্থিতি জেলখানার কয়েদী মহলে সাড়া জাগাইল। বহু পরিচিত তারাচরণ।

কয়েদীরা হাস্যমুখে দূর হইতে তাহাকে অভ্যর্থনা জানাইল একে অন্যকে বলিল, সাধু তারাচরণ এসে গেছেন।

তারাচরণ চারিদিকে চাহিল। দূরে ওই হরিশদা ঠাঁয় দাড়াইয়া আছেন, এক দৃষ্টিতে তাহাকেই দেখিতেছেন!

তারাচরণ হরিশদার দিকে চাহিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নূতন পৃথিবী

সহরের উপকণ্ঠে বাড়ীটা। সহর ও তাকে বলা চলে, গ্রামও।

মিউনিসিপ্যালিটীতে সম্প্রতি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এ অঞ্চলটাকেও তার এলাকাভুক্ত করা হইবে। সহরের রাজপথ একদিন আসিয়া এতদঞ্চলেরই এক প্রান্তে থামিয়া পড়িয়াছিল, আবার বুঝি চলিতে আরম্ভ করিবে এখানকার অধিবাসীরা সেই বাঞ্ছিত উত্তেজনাপূর্ণ দিনটীর প্রতীক্ষায় আছে! রাস্তার শেষ সীমায় যে বিজলী বাতিটা সন্ধ্যার ঠিক আগেই নিত্য জ্বলিয়া উঠে তাহা এই এলাকার অনেকখানি জায়গায়ও বিনা মাশুলেই আলো বিতরণ করে আর সেখানে একটা গাছঝোপের পাশে বর্ষনহীন রাত্রে নির্মেঘ আকাশতলে আশেপাশের বাড়ীগুলি ইহাতে অনেকে আসিয়া আডডা জমাইয়া বসে। সেখানে একটী দোকানও সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দোকানের পাশেই একটা জলার পূর্ব্ববর্ত্তী তীরটার নাতিঘন বনবাদাড়ের মধ্য হইতে একখানি বাড়ীর খাড়াঘরের একটুখানি অংশ উঁকি মারিতেছে। সেই বাড়ীরই অধিবাসী হরনাথ।

হরনাথ একা নয়, তু'জনের পরিবার তাহার। বৃদ্ধা মা আছেন, সন্ধ্যা হইতেই তাঁহার চোখের সম্মুখে আঁধার ঘনাইয়া আসে

উজ্জ্বল আলোরেখাও তাহা ভেদ করিতে পারে না। দু'টী মৃত দু'টী অর্দ্ধমৃত ও দু'টী জীবিত সন্তানের জননী হইয়া তাহার স্ত্রী এই ছাব্বিশ বছর বয়সেই দেহ ও মনে জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। হরনাথ এককালে সৌখিন ছিল, চুল ও পোষাকের পরিপাটীতে গ্রামের অনেককেই সে লজ্জা দিত, রূপের গর্বও তাহার ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে এই চৌত্রিশ বৎসর বয়সেই রুক্ষ্ম চুলে তাহার পাক ধরিয়াছে, গায়ের চামড়া হইয়া গেছে রোদেপোড়া বিবর্ণ, চোখের কোণে পড়িয়াছে কালী, আর দৈহিক ভগ্নদশার সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়া একটী দাঁতও একদিন খসিয়া পড়িয়াছে। হরনাথ যেন সংগ্রামে ক্লান্ত, হৃতবল, পর্যুদস্ত। বিগত কালের জীবনযুদ্ধে যদিই বা টিকিয়াছিল, বর্তমান সর্বগ্রাসী যুদ্ধে তাহার পায়ের তলার মাটী বিরাট ভূমিকম্পে কাঁপিয়া উঠিয়াছে।

তথাপি শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে বাঁচিতে হইবে, স্ত্রী এই কঠিন আদেশটী প্রতিমুহূর্ত্তে জানাইয়া দেয়। মা বলিয়াছেন, চোখ যাচ্ছে কেন বুঝিনা, কিন্তু প্রাণটা কি না-খেয়েই যাবে রে? মা আশ্বাস চান, মরিতে প্রস্তুত নহেন। অর্ধামৃত ছেলে আর মেয়েটী—তাহারাও বাঁচিয়া থাকিতে চায়, তা'নাহইলে এতোদিনে তো মরিবারই কথা! অবিরাম রোগে ভুগিয়া বিনা চিকিৎসায় আর পথ্যের কার্পণ্যে ক'টী শিশু টিকিয়া থাকিতে পারে? বড় ছেলেটী বারো বছরের। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে পরের বাগানের কাচা ও কচি ফল চুরি করিয়া আর কুখাদ্য বন্য ফলমূল চিবাইয়া এবং মাঝে মাঝে ক্ষুধার তাড়নায় রান্না ঘরের হাড়িকুড়ি

উজাড় করিয়া খাইয়া উদরের পরিধি বাড়াইয়া বেশ নিশ্চিন্তই আছে। তবে কোলের শিশুটী দু'হাত বাড়াইয়া মায়ের কোলে যখন ঝাপাইয়া পড়ে, তখন তাহার চোখের সেই আকুল দৃষ্টি মনে করাইয়া দেয়, সে ক্ষুধাতুর। তাহার সর্বাঙ্গে প্রকাশ পায় বাঁচিয়া থাকারই ব্যাকুলতা।

তাই সেদিন রাত্রিকালে হরনাথ আসিয়া দাঁড়ায় সেই গ্রাম ও সহরপ্রান্তের দোকানখানিতে, যদি দোকানীর দয়ায় কিছু মিলে।

দোকানে আলো জ্বলিতেছে। কেরোসিনের আলো হইলেও বেশ জোর আছে। ওপাশে রাজপথে আলোর সে সমারোহ নাই। বিজলী বাতিটী মোখসের ফাঁক দিয়া নীচের অল্প পরিসর স্থানে স্তিমিত আলোর গোলাকার ছায়া মাত্র ফেলিতেই সম্প্রতি অভ্যস্ত। সমাবেশটা দোকানের এলাকায়ই স্থানান্তরিত হইয়াছে।

দোকানীর আসর বেশ জমজমাট। ঘরের মাঝখানে বাঁশের তৈরী মাঁচার বেঞ্চে বসিয়াছেন গ্রামের মাতব্বর গোছের কয়েকজন, তাহাদের হাতে হুঁকা ফিরিতেছে। তাহারা আলোচনা করিতেছে সহরের অনেকে এবং সেই গ্রামেরও কেহ কেহ কি করিয়া এই যুদ্ধের বাজারে লাখ দু'লাখ দশ হাজার বিশ হাজার করিয়া টাকা লুটিতেছে। টাকার লুট পড়িয়াছে, শুধু প্রসাদার্থী নৈষ্ঠিক ভক্ত হইলেই হইল। কুড়ানোর কৌশলটাও জানা থাকা চাই।

দোকানের বাহিরে একটু দূরে আবছায়া আঁধারে একখানা কাঠের বেঞ্চে ও খান দু'য়েক লোহার চেয়ারে যাহারা আসর জমাইয়াছে, তাহারা অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়স্ক। তরুণ মহলে হুকা অচল কারণ তাহার শব্দে গুরুজনদের সম্মানহানির আশঙ্কা আছে, তবে আঁধারের মাঝে কাহারো কাহারো মুখে জোনাকীর মতো বিড়ির আলো জ্বলিতেছে। তাহারাও আর্থিক গবেষণায়ই মগ্ন। সস্তায় বা বিনা মূলধনে ব্যবসার কথা, বিনা কাযেই বিল সংগ্রহের কথা, দৈনিক দু'টাকা আড়াই টাকায় ঘাঁটিতে মজুরীর কথা।

হরনাথ দোকানের লোকজনশূন্য দিকে বড় কাঁটাল গাছটার আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল, যেন সে আড়ি পাতিয়া আছে।

প্রবীন মাতব্বরদের মাচার পাশে একখানা লোহার চেয়ার টানিয়া দেওয়া হইল, শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী মশায় আসিয়াছেন। জন্মগত প্রাপ্য প্রণামটাও তিনি পাইলেন। গায়ে তাঁহার জীর্ণ আধময়লা উত্তরীয়, পরণে ততোধিক ময়লা ধুতি, পায়ে তালির উপর তালি দেওয়া চটি। প্রবীণেরা এবার একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন।

ঘরের মেঝেতে বাঁশের খুঁটা ঠেসান দিয়া বসিয়া ঝিমাইতে-ছিল একটী লোক, পরণে একখানা ময়লা বিবর্ণ গামছা, খালি গা'। আরও আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য তাহার আছে। বাঁ' বাহুখানি কনুয়ের উপর পর্য্যন্ত নামিয়াই থামিয়া গেছে। সেটা যে

এককালে ছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপ বাহুর বর্ত্তমান অংশটা শুষ্ক সরু হইয়া ঝুলিয়া আছে। এককালে কাপড়ে ঢাকিয়া এই বিরূপতা সে গোপন করিয়া চলিত, এখন তার আর উপায় নাই। একটী স্ত্রী ছাড়িয়া যাওয়ার দু'বৎসর পর সে আবার আর একটা গিল্টির নোলকপরা বালিকাকে ঘরে আনিয়াছে, তাই দু'জনের আবরু রক্ষার টানাটানিতে আর তাহার অঙ্গহীনতাটা ঢাকিয়া রাখা সম্ভব নয়। নাম তাহার মোহন দাস।

মোহনের কাঁচা পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফওয়ালা শীর্ণ মুখখানা বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, দৃষ্টি তাহার স্তিমিত, টানা-টানা নিঃশ্বাসের সঙ্গে এক তালে বুকের হাড়গুলিও উঠা-নামা করিতেছে, ইহজগতে তাহার অস্তিত্ব এটুকুই। প্রবীন দীননাথের আহ্বানে তাহার চোখ দু'টা মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিল, ওহে মোহন, কর্তা এলেন যে—

দোকানী দয়াল হাতের পাল্লাটা রাখিয়া কহিল, আর এক কল্‌কে সাজতো মোহন।

মোহন খড়ফড়াইয়া উঠিয়া কল্‌কেটা হাতে লইল।

সহরে কাপড়ের ক্ষুদে ব্যবসায়ী সাধুচরণ একটী পুরাতন ও একটী নূতন ছাতা, হাতে একটা রুইমাছের মাথা ও গোটা ইলিশ লইয়া আসিয়া দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইল। কহিল, ওহে দয়াল, ম্যাচ আছে তো, ম্যাচ? দাওতো একটা—ভুলে এনাম।

দীননাথ জিজ্ঞাসা করিল, আজ বড় সকালেই ফিরলে যে সাধুচরণ?

বাড়ীতে কুটুম্ব আছে, তাই। দাওতো হে দয়াল, একটু তাড়া আছে—ব্যস্ত সাধুচরণ উত্তর দিল।

রসিকচন্দ্রের রসনা স্বভাবতই কর্কশ হইলেও রস-বিলাসী। দৃষ্টি তাহার সাধুচরণের মাছের মুড়া আর ইলিসের দিকে, বৃহৎ চন্দনা ইলিশ। কিন্তু মুখে কহিল, ও ছাতাটা কি নতুন কিনলে ?

সাধুচরণ কহিল, কি করি, ভাইপোর ফরমাস্—তেরো টাকা নিলে।

এইবার ঢোক গিলিয়া রসিক কহিল, আর—আর মাছ—?

মুড়াটা দেড় টাকা, ইলিশ সাত সিকে—বলিয়া সাধুচরণ হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। দোকান ঘরের সমাবেশে সকলে পরস্পর একে অন্যের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলিয়া চাহিল। অনেকের মুখে হতাশার ভাব, এ-তো টাকার মাছ ? দোকানের ভিতর ও বাহিরে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সাধুচরণ! যাহার ব্যবসার বাতি এতোকাল টিম্ টিম্ করিরা জ্বলিতেছিল। পুরনো বস্তা পচা কাপড় বলিয়া তাহার দোকানের ছায়া বড় কেহ মাড়াইত না।

সকলে চমকিয়া উঠিল। সহরের বুক ভেদিয়া একটা হাউই ঊর্ধ্ব আকাশে উঠিয়া ফাটিয়া গেল। ঐ যে আকাশে দীপালি খেলিয়া কয়েকটী ফানুসও ভাসিয়া চলিয়াছে। দয়াল বাঁকাস্বরে কহিল, বিয়ে হবে কাল, আজ থেকেই বাজি পোড়ান সুরু হয়ে গেছে! বড়লোকের ব্যাপার যে!

একটী লোক আসিয়া বলিল, আটা আছে দয়াল দা ?

দয়াল মাথা তুলিয়া একচোখ ছোট করিয়া কুঞ্চিত দৃষ্টিতে চাহিল, আটা ? পঞ্চাশ টাকা মণ, তুমি আবার আটা পাবে কোত্থেকে।

লোকটী কহিল, শুনলাম যে, তোমাকেও দিয়েছে একবস্তা কণ্ট্রোলে ?

দয়াল একটু থামিয়া কহিল, রোগীদের জন্যে হে, সবার জন্যে নয়, বুঝলে ? ডাক্তারের সার্টিফিকেট আছে ?

লোকটী চলিয়া গেল। দীননাথ কহিল, কিন্তু আমারটা দয়াল, আমার অবস্থা তো জান ?

দয়াল যেন আপন মনেই বলিয়া গেল, তোমার তো বলতে গেলে সবার অসুখ, লেগেই আছে! তা' দেখা যাবে।

রসিক এইবার একটু আমতা আমতা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চালের দর আজ কত হে ?

দয়ালের মুখ গভীর অন্ধকার হইয়া আসিল। সে নিরস শুষ্ক মুখে উত্তর দিল, বত্রিশ টাকা!

কয়েকজন সমস্বরে বলিয়া উঠিল, বত্রিশ টাকা ?

শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী এতোক্ষণ পর কথা কহিলেন, তা' দয়াল ..

দয়াল যেন তাহার কথা শুনিতেই পাইল না। দীননাথকে সম্বোধন করিয়া কহিল, বুঝলে খুড়ো, ধারে বিক্রী একেবারে বন্ধ করে দিলাম। আর পারিনা। জানি গাঁয়ের লোকের দুর্দ্দশা, কিন্তু আমার কিসে চলে, তা'ও তো সবাইকে দেখতে হবে।

আমি তো এক কানাকড়ির মালও ধারে পাইনা। তাই প্রতিজ্ঞা করে ধার বন্ধ করেই দিলাম।

আর একটা হাউই সশব্দে আকাশে উঠিল। আকাশে নানারঙের আলোর বিচ্ছুরণ। অনেক টাকাই ঢেলেছে যা'হোক! শ্রীপতি চক্রবর্তী চাদরখানি টানিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। একখানা গামছার পুটলী চাদরের নীচে আবার সামলাইয়া লইলেন যেন কাহারও দৃষ্টি সেখানার উপর না পড়ে। রসিকের মুখ মলিন হইয়া গেল। মোহন এতোক্ষণ মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিতেছিল, এইবার চোখ বুজিয়া আস্ত হাতখানি হাঁটুর উপর রাখিয়া খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিল।

হরনাথ তখনো কাঁটালগাছের তলায় আঁধারেই দাঁড়াইয়া আছে। হাউইএর শব্দে যেই মাথাটা সোজা করিয়াছে অমনি তাহার মাথায় ঠেকিল একটি কাঁটাল। আঁধারেও সে হাত বুলাইয়া দেখিল, কম বড় নয়। দয়াল আর দয়া করিবে না ঘরে যা' চারটী চাল আছে তার সঙ্গে এই কাঁচা কাঁটাল-সিদ্ধ·········কিন্তু রোগী ছেলেমেয়ে দু'টি? হোক, তবু এ লোভনীয়—

গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে দুইটি যুবক দোকানে আসিয়া সিগারেট চাহিল—ক্যাপষ্টান আছে, ক্যাপষ্টান?

আট আনা প্যাকেট, বলিয়া দয়াল একটা প্যাকেট আগাইয়া ধরিল।

একজন কহিল, সহরে তো ছ' আনা।

দয়াল প্যাকেটটী রাখিয়া দিয়া কহিল, এটা সহর নয়।

বাহিরের আসরে যুবক দু'টীর ডাক পড়িল, কোথায় যাওয়া হচ্ছে, সিনেমায় ?

নবাগতের একজন কহিল, সেকেণ্ড শোতে যাচ্ছি, আজ যে 'সোনার সংসার' ?

'সোনার সংসার' ? দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শ্রীপতি বিমর্ষমুখে আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিলেন। হরনাথ তখন গাছতলা হইতে জলার ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীপতি কহিলেন, কে ?

হরনাথ যেন চমকিয়া উঠিল। ঢোক গিলিয়া উত্তর করিল, আমি—হরনাথ। হরনাথ তাহার পায়ের কাছে পতিত কাঁটাল-টীকে পা' দিয়া ধীরে ধীরে জলায় ঠেলিয়া দিল। সেটা প্রায় নিঃশব্দেই গড়াইয়া গেল।

বাঁচিবার আশ্বাসেই হরনাথ ভোরবেলা কর্মস্থলে ছুটিল। সহরের অন্যপ্রান্তে কাঠের কারখানায় সে মোহরের। সে চাকুরে—মাসের প্রথমেই নিয়মিত বাইশ টাকা করিয়া বেতন পায়। মালিক বিবেচনাহীন নহেন, বরং তাঁহার বিচারবুদ্ধি একেবারে অঙ্ক কষিয়া তৌলপাল্লায় ওজন করিয়া কর্তব্য স্থির করে, তিনি হরনাথকে মাগ্‌গী ভাতা দিয়াছেন শতকরা বিশ টাকা হিসাবে চারটাকা ছ'আনা আট গণ্ডা। সুতরাং সম্প্রতি সে মাসিক ছাব্বিশ টাকা ছ'আনা আটগণ্ডার চাকুরে। ভদ্রলোক সে, এর বেশী প্রত্যাশা করিতে পারে না।

ভোরবেলাই সহরের মধ্য দিয়া শূন্য উদরে চলিয়াছে হরনাথ। চায়ের পাট অনেকদিন হইতেই উঠিয়া গিয়াছে। চা ও চিনি দু'টাই দুর্মূল্য, তার উপর দুধ --তাহা প্রায় অদৃশ্য।

রেস্তোরাঁর পাশ দিয়াই সে যাইতেছিল। কে একজন তাহাকে বুঝি ডাকিল, দেখুন। লোকটী বাহির হইয়া আসিল। সে কর্মী ও প্রকাশহীন পত্রিকা-সম্পাদক চিন্তাহরণ। হাতের চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কহিল চিন্তাহরণ, আপনাদের কি'হল ?

লোকটী হরনাথের অপরিচিত নয়। তাহাদের কারখানা অঞ্চলে ইহাকে সে আরও দেখিয়াছে। সে উত্তর করিল, কিসের ?

চায়ের কাপে আর এক চুমুক দিয়া চিন্তাহরণ কহিল, ধর্মঘটের কথা বল্‌ছি। আপনারা যদি আজকার দুনিয়ায় বাঁচতে চান, তা'হলে দল গঠন করে চাপ দিন। ধর্মঘট না করলে ওরা·····আমরা দিচ্ছি সংবাদপত্রে এজিটেশনে চাপ— আপনারা দিন্ এদিকে। দু'দিক থেকে চেপে ধরলে—

ইতিমধ্যে চায়ের কাপ নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। চিন্তাহরণ হাত বাড়াইয়া কাপ্‌টী রেস্তোরাঁর টেবিলের উপর রাখিয়া পকেট হইতে একটী সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল।

হরনাথ এতোক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কহিল, সে. তো সত্যিই—তবে সবাই যদি রাজী হয়, তবে তো !

এই ভোর বেলাই ভিখারীর মেলা পথে পথে। এতো ভিক্ষার্থী সহরে কোন কালেই ছিল না। সহরের লোকসংখ্যা অনেক

বাড়িয়াছে। সাদা কালো সৈনিকও কয়েক হাজার। ইহারা তখনো পথে বাহির হয় নাই। তবে সৈন্যদের মালবাহী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মোটর গাড়ীগুলি যাতায়াত করিতেছে। ওই গুলিতে আছে হয়তো কতো কি রসদ, খাদ্য-দ্রব্য।

দশটা বাজিতেই কারখানার মালিক মজুরদেরে কহিলেন, সস্তায় চাল বিলি হ'বে মিউনিসিপ্যালিটীতে—তোমাদের যা'র ইচ্ছা যেতে পার।

হরনাথ কহিল, আমিও যাব, যদি ছুটি দেন।

মালিক কহিলেন, যাবে? যেতে পার—খাতায় লিখে যাও, এ বেলা দু'ঘণ্টা আগেই গেলে।

কতোক্ষণ চুপ করিয়া হরনাথ বসিয়া রহিল। তারপর আস্তে আস্তে খাতা খুলিয়া লিখিল—সেদিন সকালে দশটায়ই সে ছুটী নিল।

মিউনিসিপ্যালিটীর সম্মুখে প্রকাণ্ড ভিড়। লোকে লোকারণ্য। শুধু মানুষের জনতাই চোখে পড়ে, চাল কোথায়? এতোলোকে আজ এখানে আসিয়া ভিড় করিয়াছে, কিসের প্রত্যাশায়!

হরনাথ একেওকে জিজ্ঞাসা করে, চাল দেওয়া হচ্ছে এখানে?

এখনও হয়নি,, একটী লোক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে,—কখন দেওয়া হ'বে জানিনা। দেওয়া হ'বে কিনা তাই বা আগেভাগে কি করে বল্‌তে পারি?

কে একজন চীৎকার করিয়া ভিড় নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। জনতায় উঠিয়াছে কোলাহল, তারপর সমস্ত

নিস্তব্ধ। কর্তৃপক্ষ হইতে আদেশ হইয়াছে, গোলমাল ঠেলাঠেলি করিলে, কেহই চাল পাইবে না। নীরবে, নিশ্চল হইয়াও অদৃষ্টের এই মার খাইতে সকলে প্রস্তুত, তথাপি অন্নহীন গৃহের বিভীষিকা ও উদরের বিদ্রোহ তাহারা সহ্য করিতে পারেনা।... একে একে সকলে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইল—ইহাদেরে টিকিট বিলি করা হইবে। হরনাথও এইবার সেই সারিবদ্ধ লোকগুলির মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের জনতা বৃদ্ধি করিল।

কিন্তু হরনাথদেরই কারখানার রহিমুদ্দি বিস্মিত হইয়া দেখিল, টিকিট বিলি আরম্ভ হইতেই হরনাথ অকস্মাৎ লাইন ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। ব্যাপার কি! রহিমুদ্দি ডাকিল, বাবু!......চলে যাচ্ছেন যে?

পরিচিত কণ্ঠস্বর। হরনাথ একবার তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল মাত্র, তারপরই হনহন করিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল। রহিমুদ্দি জানে না, জানিবার কথা নয়—হরনাথও বলিতে চায় না যে, কি-জানি কেন, কিছু না ভাবিয়াই সে শুধু মালিককেই ফাঁকি দেয় নাই, নিজেকেও ফাঁকি দিয়াছে। পকেট তাহার শূন্য, টিকিট সে পাইবে কিসে?

রাস্তার ওপাশে একটা গাছের আড়ালে গিয়া বিশেষভাবে রহিমুদ্দির দৃষ্টি এড়াইয়া হরনাথ আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইল। সেখান হইতেই সে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল, সেই সারিবদ্ধ জনতার দিকে। ইহাদের খাদ্যসংগ্রহের আনন্দেই যেন সে তৃপ্ত হইতে চায়। এতোগুলি লোক তো চাল পাইবে?

দল বাঁধিয়া আর একটী জনতা আসিয়া উপস্থিত। তাহাতে পুরুষ আছে, নারী আছে, বৃদ্ধ আছে, শিশু আছে। দীর্ঘ কালের অ-স্নান ও অনশন তাহাদের কঙ্কালগুলিকে আরও অদ্ভুত রুক্ষ করিয়া তুলিয়াছে। তথাপি অদম্য তাহাদের চেষ্টা। তাহারা এই সহরের নয়, নিকটবর্ত্তী গ্রামেরও নয়, এই জেলারও নয়, আসিয়াছে ভিন্ন প্রদেশ হইতে অন্নাভাবে জীবন রক্ষার তাড়নায়। কি করিয়া তাহাদের কাটিয়াছে দীর্ঘ বৈচিত্র্যময় এই অভিযান-কাল কেহই জানে না, হরনাথও নয় কিন্তু বর্ত্তমান কালের কঠোরতা তাহাদের দেহে, মুখে, সর্বাঙ্গে যে নির্দয় চিহ্ন আঁকিয়া রাখিয়াছে, তাহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। এই সব কঙ্কালেরা আসিয়া চীৎকার তুলিল, ক্ষীণকণ্ঠের চীৎকার, চাল চাই—খাবার চাই।

ছুটিয়া আসিল একদল পুলিশ, ছুটিয়া আসিল আরও অনেকে, ইহাদের অনধিকার প্রবেশ রোধ করিতেই হইবে।

হরনাথ আর সেখানে দাঁড়াইল না। দাঁড়াইয়া থাকিতে সে পারিল না।

রহিমুদ্দিও চলিয়াছে। কিন্তু শুষ্ক, ম্লান, নিরাশাহত তাহার মুখ। সে হরনাথকে পাশ কাটাইয়া যাইতেছিল। এইবার হরনাথই তাহাকে ডাকিল, রহিম, চাল নিলে না?

রহিম কহিল আহত কণ্ঠে, দিলে না, আমি যে সহরের বাইরের লোক!

ম্লান হাসি হাসিয়া হরনাথও কহিল, আমি ও যে তাই! এইবার রহিমুদ্দির কাছে সে তাহার আচরণের উপযুক্ত কৈফিয়ৎ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

বাড়ীর পথেই চলিয়াছে হরনাথ।

একটী বৃহৎ প্রাসাদের সম্মুখে অনেকগুলি মোটর। হরনাথ বুঝিতে পারে না, এখানে আর একটী জনতা কিসের উদ্দেশ্যে। একটী মোটরের দরজা সশব্দে খুলিয়া চুরুট মুখে নামিয়া আসিল কর্মী চিন্তাহরণ। ডাকিল, শুনুন।

হরনাথ চাহিল, কিন্তু সে নীরব।

চিন্তাহরণ কহিল, মনে আছে তো যে কথা বলেছি? আজ এখানে সবাই এসে মিলেছেন, খাদ্য-সমস্যার সমাধানের জন্যে। একটা উপায় হবেই।...... ওই যে, উনিই সভাপতি হয়েছেন কিনা! যাই, তাঁরা এসে পড়েছেন। চিন্তাহরণ দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

হরনাথ চাহিয়া রহিল। ইহাদের অনেকেকই সে জানে, আরোও দেখিয়াছে। ইহাদেরে দেখিয়াছে ভয়-বিস্ময়ের দৃষ্টিতে, শ্রদ্ধা করিয়াছে, সম্ভ্রম দেখাইয়াছে। আজ এই প্রথম কিজানি-কেন হরনাথের মনে হইল, ইহারা খাদ্যসমস্যার সমাধান করিতে পারেন না। দেহে, পোষাকে, পরিচ্ছদে, অভিব্যক্তিতে তাহাদের সঙ্কটের কোন চিহ্নই নাই। জীবনে ইহাদেরে প্রথম সে অবিশ্বাস করিল।

মোটরগুলি তখনও চলে নাই—হরনাথ ছুটিয়া চলিল।

ব্যাণ্ড বাজাইয়া চলিয়াছে একটি শোভাযাত্রা। সেই শোভা-যাত্রায় প্রতিমাও নাই, বরকন্যাও নাই। ছবিঘরের সেই শোভা-যাত্রা। দু'সারি লোকের গলায় ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ছায়াছবির প্ল্যাকার্ড। ছবিঘরে 'নয়াদুনিয়া' ছবি আসিতেছে, তাহারই প্রচারপত্র। চিত্রের নায়িকার—রূপসী চিত্র-তারকার আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটাইয়া তুলিয়া যে বৃহদাকার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাই বহন করিয়া চলিয়াছে দুইটি জীর্ণদেহ শ্রমিক, শোভাযাত্রার পুরোভাগে। ইনিই রূপালী পর্দায় উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবেন, নয়াদুনিয়ার রূপ। শ্রমিকদের কাঁধে চড়িয়া তাহারই বিজ্ঞাপনী শোভাযাত্রা চলিয়াছে।

হরনাথ ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল, এই অপরূপ রূপসী তারকার অপূর্ব ভঙ্গিমার দিকেই শুধু। উদরের ক্ষুধা মানুষের রূপের ক্ষুধা ভুলাইতে পারে না?

প্রপাগাণ্ডাভ্যান হইতে লাইডস্পীকারে সঙ্গীত ধ্বনিত হইল, বিদেশী রণসঙ্গীত। তালে তালে সৈনিকেরা মার্চ করিয়া চলিয়াছে। অপূর্ব এক উত্তেজনায় তাহার দুর্বল দেহের রক্তও টগ্‌বগ্‌ করিয়া উঠে। হরনাথ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়ায়। মাইকে এবার কে কথা বলিতেছে। স্পষ্ট, ধীর তাহার কণ্ঠস্বর--। টিউনিসিয়ায় যুদ্ধজয় হইয়াছে, হিটলারের পরাজয় ঘটিয়াছে। এইবার মিত্রশক্তি তাহার উপর হানিবেন, প্রচণ্ড আঘাত। --জার্মেনীর—অক্ষশক্তির মৃত্যু অনিবার্য। তাহাদেরই শ্মশান-ভূমিতে জন্ম নিবে, শান্তি ও সমৃদ্ধিপূর্ণ নূতন পৃথিবী—সেই

'নয়াদুনিয়া'য় বাঁচিয়া থাকিবে মানুষ…অশান্তি সৃষ্টিকারী দস্যুদল নয়।

নয়াদুনিয়া—হিটলার—যুদ্ধ! যুদ্ধ! সবকথা যেন হরনাথ বুঝিতে পারে না, বিশ্বাসও করিতে পারেনা। তবে যুদ্ধ—যুদ্ধের ভয়াবহতা সে মর্মেমর্মে উপলব্ধি করে। সহসা তাহার সারা দেহ মন হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। আবার তাহার অবসন্ন প্রাণ যেন সারা দেহকে নূতন তেজোদৃপ্ত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, যুদ্ধ সেও করিবে—জীবন-যুদ্ধ। জীবন-যুদ্ধে তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। মাতা, স্ত্রী, পুত্র কন্যা সকলকে লইয়া নূতন পৃথিবীতে সে বাঁচিয়া থাকিতে চায়। সে দৃঢ়পদে চলিতে থাকে।

তাহার সমস্ত উত্তেজনা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা আবার ভাঙ্গিয়া যায়,—চাহিয়া দেখে সম্মুখেই দয়ালের দোকান। জ্যৈষ্ঠ মাসের তপ্ত রৌদ্র পৃথিবীকে দগ্ধ করিতেছে, তাহাকেও করিয়াছে, এই প্রথম সে অনুভব করে। পায়ের তলায় পৃথিবীর জ্বালার বাষ্প উত্থিত হইতেছে। গাছপালা সব স্তব্ধ ক্লান্ত দেহে দাঁড়াইয়া আছে।

হরনাথ ধীরে ধীরে অবসন্ন দেহে গিয়া জলার ধারের পথটীতে থমকিয়া দাঁড়ায়। জলার মধ্যে কি-যেন সে অনুসন্ধান করে। ঐ তো দলদামের মাঝখান দিয়া উঁকি মারিতেছে, সেই কাঁটাল।

দয়াল স্নান করিয়া গামছা পরিয়া চটী হাতে কৃষ্ণের শতনাম জপিতে জপিতে আসিতেছিল।

যখন কৃষ্ণ জন্ম নিলা দেবকীর উদরে।
মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে॥

হরনাথ চমকিয়া উঠিল। দয়াল সপ্রশ্ন কুঞ্চিত দৃষ্টিতে চাহিল, যেন, কি দেখছে হে হরনাথ?

হরনাথ ঢোক গিলিল, শুষ্ককণ্ঠের নিরস ঢোক। কহিল, কাঁটাল! জন্ম মাত্রেই দয়ালের কণ্ঠের কৃষ্ণের শতনাম শেষ হইয়া গেল। কাঁটাল? কই? কোথায়? দয়াল ছুটিয়া আসিল। আজ সকালে উঠে দেখি, গাছে কাঁটালটী নেই। ওই যে আমারই কাঁটাল। হায় হায় হায়রে, এখন কি করি? এই মাত্র স্নান করে এলাম।

আমিই তুলে দিচ্ছি, দয়ালদা। —বলিয়াই হরনাথ জলায় নামিয়া পড়িল।

বাঁচালে দাদা বাঁচালে। দয়াল কহিল, হরিহে, তুমি নিশ্চয়ই আছ। কি-জান হরনাথ, আজ ভক্তিভরে মাথাকুটে মানত করলাম, পাঁচ পয়সার লুট দেব। এতো বড় কাঁটাল, কম্‌সে কম দেড়টা টাকা হবে দাম—হরিহে, তুমিই সত্য।

হরনাথ কাপড়ে চোপড়ে দেহে তখন অদ্ভুত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—তথাপি তাহার মনে হইল, এইবার বুঝি সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতে পারিবে।

জীবনী

রাজা শ্বেতকেতু, রাণী মধুচ্ছন্দা। পুরাকালের কাল্পনিক কলিঙ্গের অধিপতি আর সে-রাজ্যেরই মহারাণী। আর আমাদের বর্তমান কালের জীবন ভট্ট ও প্রেমদা। তাহারা দু'জনেও রাজা ও রাণী।

আরো দশজন ছেলেমেয়ের মতোই ইহাদেরও মাটীতে পড়িয়া ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া জীবনের সূচনা হইয়াছিল। কৈশোরের কাহিনী ও সেই একই। তবে জীবনের সমস্ত জীবনীই একেবারে সাধারণ নয়।

দুর্গোৎসবে, শ্রাদ্ধবাসরে, উৎসবানুষ্ঠানে দল বাঁধিয়া ভট্ট ব্রাহ্মণেরা উপস্থিত হয়, নিজেদের রচিত ভাটের কবিতা সুর করিয়া আবৃত্তি করে—শিবদুর্গার দ্বন্দ্ব কলহ, সতীর পিতৃগৃহে গমন, দক্ষযজ্ঞ, সীতাহরণ, রাবণবধের গাঁথা গাহিয়া ব্যক্তি বিশেষের প্রশস্তি রচনা করিয়া, গুণকীর্তনে এবং স্থান বিশেষে নিন্দায় মুখর হইয়া সর্বদা ভ্রাম্যমান থাকিয়াই ইহারা জীবিকা অর্জন করিত। কিন্তু সেই ভট্টবংশের ছেলে হইয়া এবং কিশোর বয়সেই গাঁথা-রচনায়, বাংলা ভাষায় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াও জীবন সে-পথে গেলনা, ভিন্ন পথ গ্রহণ করিল। এক-গুঁয়ে অস্বাভাবিক এই ছেলেটী যে সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র হইবে

এ যেন ছিল সকলেরই জানা, তবে এই পরিবর্তনের পেছনে একটুখানি কাহিনীও রহিয়াছে।

জীবনের বয়স তখন ষোল সতেরো বৎসর। তাদের জন-বহুল বৃহৎ গ্রাম হরিশপুরের এক প্রান্তে চৌধুরীপাড়ায় রায়দের বাড়ীতে বড় রায় মহাশয়ের মেয়ের বিবাহ, বিরাট সমারোহ। সারা গ্রামের হিন্দু অধিবাসীরা ভোজন ও গীত-নৃত্যাদি শ্রবণা-বলোকনের নিমন্ত্রণ পাইয়াছে। বিবাহ-দিবসে জীবনেরাও নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছে। ভোজন-ব্যাপারে তাহারা পরিতৃপ্ত হইলেও গোল বাঁধিয়াছে দক্ষিণার বেলা। ভট্ট-ব্রাহ্মণেরা চিরকালই দাবী করিয়া দক্ষিণা আদায় করে: তাহাদের অধিক-দাবী কৌলিন্য-মর্যাদার নয়, স্বাতন্ত্র্যের ও সম্ভবতঃ চারণ-বৃত্তির। কিন্তু রায় মহাশয় সেই দাবী তাচ্ছিল্যভরে শুধু উপেক্ষাই করেন নাই, হাতের ইঙ্গিতে তাদেরে বাড়ীর সম্মুখের পথটীও নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

কিশোর জীবন বয়োবৃদ্ধদের নেতৃত্ব উপেক্ষা করিয়াই সেদিন উত্তেজিত হইয়া সকলের পুরোভাগে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে সুর ধরিয়া সতেজকণ্ঠে স্বরচিত ছড়া ধরিয়াছিল—

শুনেন মহাশয় সদাশয়
আমরা ভিক্ষা করি।
দরিদ্রের বেলাই যত আপনার জারিজুরি॥
এমন চোখরাঙানি—

সকলে হা-হা করিয়া উঠিয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়াছিল। বিদেশে ভট্টকবিদের হুমকি খাটিতে পারে, কিন্তু প্রতিবেশী প্রতিপত্তিশালীর বিরাগ-ভাজন হওয়ার বিপদ অনেক। জীবন কিন্তু এইখানেই থামিল না। সে সেদিন হইতে সেই বংশানুগত চারণ-বৃত্তি ত্যাগ করিল—স্কুলের অধ্যয়নও সেখানেই তাহার শেষ হইল। রায় মহাশয়দের বাড়ীতে যে বিদেশী যাত্রাদল আসিয়াছিল, একদিন পিতামাতার অজ্ঞাতেই জীবন তাহাদের সঙ্গী হইল এবং চারমাস অজ্ঞাতবাসের পর একদিন সে কিছু টাকা পাঠাইয়া উৎকণ্ঠিত উদ্বিগ্ন পিতাকে লিখিল, পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেবতা মহাশয়, আমি আপনাদিগের শ্রীচরণাশীর্বাদে যাত্রাদলে যোগদান করিয়া…………ইত্যাদি।

তারপর বেশ কিছুকাল কাটিয়া গেছে। জীবনের কৈশোর যৌবনের পূর্বাহ্ণে আসিয়া নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এখন তাহার মুখে একজোড়া কালো ঘন সুন্দর সুবিন্যস্ত গোঁফ, মাথায় কাঁধ-ছাটা বাব্‌রি চুল, দেহে মাংসল কঠিনতা। বিদেশের যাত্রাদলও সে ত্যাগ করিয়াছে, এখন দেশেরই একটী বিখ্যাত দলের সে প্রধান অভিনেতা বা এক্টর। এখন আর সে রাখাল বালক, কৃষ্ণ বলরাম সাজে না, রাজপুত্রের কালও কবে অতীত হইয়াছে, এখন তাহার রাজার ভূমিকা, প্রাচীন ভারতের পুরাণের কতো রাজা।

রায়মহাশয়ের বাড়ীরই আলোকোজ্জ্বল আসরে সে একদিন

রাজা সাজিয়া কাঠের চেয়ারের সিংহাসনে বসিয়াছিল। গায়ে তাহার লালকালো মকমলের উপর সল্‌মা-চুম্‌কির কাজকরা পোষাক। ঝুটা জরির রাজমুকুট। কোমরবন্দে কোষবদ্ধ টীনের তরবারী। সে কলিঙ্গের রাজা শ্বেতকেতু, তাহার পার্শ্বে উপবিষ্টা সে-দেশেরই রাণী মধুচ্ছন্দা। রাজা শ্বেতকেতুরূপী জীবন সেদিন আসরে সমবেত জনতাকেই লক্ষ্য করিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, হে প্রিয় প্রজাবৃন্দ! বলিয়াছিল, আমার এই বিশাল রাজ্যভার গ্রহণ তোমাদেরই প্রতিপালনের জন্য। রাজানুরঞ্জনই রাজধর্ম। রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারি যা'তে আমার রাজ্যে না থাকে না ঘটে, যা'তে আমার রাজ্যে কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত না হয়, আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাই লক্ষ্য করব। দুষ্টের দমনে এবং শিষ্টের পালনে আমার এই কোষবদ্ধ তরবারি যেন অক্ষমতা প্রদর্শন না করে। দানে, দক্ষিণায়, ভিক্ষুকেরে অন্নদানে, আর্তত্রাণে·········

সেই রাজা শ্বেতকেতু আর রাণী মধুচ্ছন্দা। জীবন ভট্ট আর সেই গাঁয়েরই উত্তর পাড়ার আর একটি ছেলে রসিক কাপালি।

গ্রামে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, রাজা শ্বেতকেতুর অভিনয় চমৎকার, জীবন্ত অনুকৃতি। হাই স্কুলের ইতিহাসের মাষ্টার অনাদি চৌধুরী, শুধু যাত্রা থিয়েটার পরিচালনায় ও মাষ্টারীতেই নয়, বড় বড় কঠিন ভূমিকাভিনয়েও ছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন, তাঁহার

কুণ্ঠিত প্রশংসায় স্কুলের ছেলেরাই বলিল, না স্যার, লোকে বলে, জীবন ভট্ট আপনাকেও টেক্কা দিয়েছে।

জীবনকে আর কেউ জীবন বলে না, বলে রাজা শ্বেত-কেতু। বলে কেউবা প্রসংশায়, কেউবা উপহাস করিয়াও। ক্রমশঃ সে 'রাজা' হইয়াই উঠিল, 'জীবন'টা তলাইয়া গেল। জীবন শোনে, আত্মপ্রসাদ লাভ করে, আবার অন্যের বিদ্রূপে গম্ভীর প্রশান্ত হাসি হাসিয়াও বলে, রাজা বৈ কি? স্বভাবে তাহার অনেক পরিবর্তন আসিয়াছে, রাজার পক্ষে উত্তেজিত হইয়া উঠা অস্বাভাবিক।

পিতা তাহার রাজত্ব লাভের পূর্বেই ইহলোকের মায়া কাটাইয়াছেন। বৃদ্ধা জননী বলেন, ওরে জীবনা, রাজা সেজে বেড়ালেই কি চল্‌বে রে?

জীবন হাসে, বলে কেন চলবে না মা? রাজা শ্বেতকেতু কি বলেছিলেন জান? শোনো। আমি তো শুধু শ্বেতকেতু নই, আমি রাজা শ্বেতকেতু। আমি একা নই, আমার সাথে রাজ্যের অগণিত প্রজা মিশে আছে, আমি আমার নই, লক্ষ কোটীর।

জীবনের জননী বিস্মিত নির্বোধ দৃষ্টি মেলিয়া পুত্রের দিকে চাহিয়া থাকেন, ভাবেন, নিশ্চয়ই তাহার কোথায় কি গোলমাল ঘটিয়াছে। একটী বধূ না হইলে এই দোষ শুধরাইবার নয়।

বলেন, জীবনা, আর কতোকাল ঘর সংসার একা চালাব রে? এবার একটী...... .....

জীবন আবার রাজার বক্তৃটাই জুড়িয়া দেয়।

কিন্তু রাজার-নেশায় পাওয়া জীবনের একদিন রাণীও জুটিয়া গেল, দূর উত্তর দেশের ভট্টকন্যা প্রেমদা। প্রেমদাকে বাসর ঘরেই চুপি চুপি জীবন শুনাইয়া রাখিল, জান প্রেমদা, লোকে আমাকে রাজা বলে ডাকে, রাজা শ্বেতকেতু। তুমি তা' হলে? তুমি হলে রাণী মধুচ্ছন্দা। কিন্তু আমি ডাক্‌ব তোমাকে মধু।

মধুপানের জন্যই জীবনের তৃষাতুর অধরোষ্ঠ নাটকীয় ভঙ্গীতে আগাইয়া গিয়াছিল, নববধূ প্রেমদা মধুভাণ্ড হাতের আড়াল করিয়া কৃত্রিম কোপভরে বলিয়াছিল, ধ্যাৎ।

দেশবিদেশে গিয়া যাত্রার দলে রাজা সাজিয়া আর পৈত্রিক খামার জমিতে ফসল ফলাইয়া জীবনের জীবন কাটিতেছিল মন্দ নয়, দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া সে আর স্বজাতীয়দের ন্যায় দক্ষিণার কলহ আর ভিক্ষা-বৃত্তিতে জীবন ধারণ করে না। দেবদেবীর আর বড়লোকদের প্রশস্তিও তার রচনা করিতে হয় না। কিন্তু গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় তাহাকে লইয়া অনেক কিছুই রচিত হইতে থাকে।

গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার হাটে ছোট পোষ্টাফিসের দু'চালা টিনের ঘরটার বারান্দার সম্মুখে হাতলভাঙ্গা চেয়ারে বসিয়া ১৫৲ টাকা বেতনের একষ্ট্রা ডিপার্টম্যান্টাল পোষ্টমাষ্টার নবকিশোর যে আসর জমান, সেখানে রাজা জীবনের নাটকীয় জীবন লইয়া

অনেক আলোচনাই হয়। কদাচিৎ খাম পোষ্টকার্ড কিনিতে কিম্বা চিঠি ডাকে দিতে গেলে নবকিশোরের জোড়া ঘন ভুরুর নীচে চোখ দু'টী কৌতুকে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, বলেন, কি হে রাজাধিরাজ, কোন রাজ্য থেকে এবার আহ্বান আস্‌ছে? অযোধ্যা না মগধ, বিদর্ভ না পাঞ্চাল?

জীবন গোঁফে আঙ্গুল বুলাইয়া গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেয়, জানিনা তো, কোথায় দুর্ভিক্ষ অনাহার অরাজকতা.........সকলে হাসিয়া উঠে। জীবনও সে-হাসিতে যোগই দেয়, তবে সে-হাসি নীরব রাজোচিত সংযম ও গাম্ভীর্যে উদ্ভাসিত।

গ্রামের মাঠে জমিতে যখন লাঙ্গল পড়ে, তখন ক্ষেতের কাজে সাহায্য করিবার জন্য জীবনও মাঠে গিয়া উপস্থিত হয়. চাষ করা জমির ঘাস বাছে, আল কাটে, মই দিয়া মাটি ভাঙ্গে। মাঠের চাষা প্রতিবেশীরা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে, রাজারা কি হালচাষ করে ঠাকুর?

জীবন উত্তর দেয়, রাজর্ষি জনক নিজের হাতে হালচাষ করতেন, তা'কি জাননা?

বামাচরণ ভট্ট বিধবা ভ্রাতৃবধুকে যেদিন চরিত্রহীনতার অপবাদ দিয়া গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেয়, সেদিন জীবন গিয়া কঠোর মূর্তিতে উপস্থিত হয়, আদেশ করে, খুড়ীমাকে ঘরে নিতেই হবে। এ বাড়ীতে বাস করবার রামচরণ খুড়োর বিধবারও অধিকার আছে।

বামাচরণ প্রথম বীভৎস হাসিতে ফাটিয়া পড়ে, তারপর সেই পাকা দাড়িগোঁফওয়ালা বেঁটে কুটিল মূর্তিটা হিংস্র হইয়া উঠে, বলে, বেরিয়ে যাও এখান থেকে, রাজাগিরি ফলাতে এসেছ ?

সেদিন জীবন গর্জিয়া উঠে, সাবধান।

বামাচরণের স্ত্রীও যুদ্ধে যোগদান করেন, একেবারে সশস্ত্র হইয়া,···বটী আস্ফালন করিয়া বলেন, সাবধান জীব্না, আমাদের ঘরের কথায় কথা বল্‌তে আসিসনে।

জীবন দেখে, ব্রাহ্মণ হত্যা, নারীর সঙ্গে সংগ্রাম, রাজধর্ম বিরুদ্ধ। সে রামচরণের বিধবাকে স্বগৃহে আনিয়া আশ্রয় দিয়াই রাজধর্ম পালন করে।

কিন্তু অবশেষে একদিন জীবনের এই রাজধর্মপালন গ্রাম্য সমাজের কাছে অসহনীয় হইয়াই উঠিল।

মাঘ ফাল্গুন দুইমাস যাত্রাদলের সঙ্গে বিবাহের আসরে রাজার ভূমিকায় অভিনয় করিয়া চৈত্রের মাঝামাঝি জীবন গৃহে ফিরিয়া আসিল। গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় তখন বসন্তের বার্ষিক সমারোহ আরম্ভ হইয়া গেছে। প্রতি বৎসরই আশ্বিন কার্তিক মাসে কলেরার দৈত্য আর চৈত্র বৈশাখে বসন্তের দেবতা মা শীতলার করুণা হইতে বহুকাল যাবত এই বৃহৎ পল্লীটী বঞ্চিত হয়না। সুতরাং এবারকার বসন্তও নূতন এবং অভিনব হইয়া আসে নাই। এবারও প্রতিবারের ন্যায় মুসলমান পাড়াগুলিতেই

বসন্ত জাঁকিয়া বসিয়াছে। কিন্তু গ্রামের দুর্দশা শুধু এই রোগেই শেষ হইল না।

একদিন চৈত্রের অপরাহ্নে মাঠের চাষকরা জমিগুলি দেখিতে গিয়া জীবন দেখিল, সারাটী মাঠ সেদিন স্তব্ধ হইয়া আছে। অন্যদিনের মতো দিকে দিকে চৈত্রের বাতাস ধূলার কুণ্ডলী পাকাইয়া উদ্দাম বালকের ন্যায় খেলিয়া বেড়ায় না। গাঁয়ের পাশের করচ-মান্দারের গাছগুলির তলায় জমিয়া-থাকা শুষ্ক পাতা সেই অদ্ভুত শব্দ করিয়া মাঠের নীরবতা ভঙ্গ করে না। দূরে বিলের তীরে তীরে সাদা বকগুলি পালে পালে তেমনি বসিয়া আছে, কিন্তু তাহারাও যেন কিসের প্রত্যাশায় স্তব্ধ গাঢ় ছায়াধূসর পশ্চাদপটের উপর অঙ্কিত কতকগুলি ছবি!

পশ্চিমে বায়ুকোণের আকাশের দিকে চাহিয়া জীবন দেখিল সত্যি মেঘ জমিয়াছে। কালো থম্‌থমে মেঘ। গ্রামের কালো গাছপালার মাথা ছাড়াইয়া অনেক—অনেক উপরে পর্যন্ত আকাশ জুড়িয়া সেই মেঘরাশি স্তব্ধ হইয়া আছে। অপরাহ্নের সূর্যের আলো যেন পরাজয়ের লজ্জায় লাল লইয়া কালো মেঘের মাঝে মিশিয়া গেছে। সন্ধ্যার এখনো বাকী, কিন্তু এখনই কাকগুলি গাছে গাছে উড়িয়া আর্তকলরব জুড়িয়া দিয়াছে। চিলগুলি ডানা মেলিয়া এতোক্ষণ বিলের অনেক উপরেই উড়িতেছিল, এখন আরও ঊর্ধ্বে উঠিয়া হারাইয়া গেছে।

জীবন ভাবিল, যাত্রাভিনয়ে তাহার ভূমিকার কথা। রাজা

সুরথ গভীর বনে পথ হারাইয়াছেন, আকাশে ঝড় উঠিয়াছে—প্রলয়ের ঝড়। শুধু কথায় আর অঙ্গভঙ্গীতে আর ছুটাছুটিতে তাহাকে একা আলোকোজ্জ্বল আসরের মাঝেই সেই ঝড়ের দৃশ্য ফুটাইয়া তুলিতে হয়। আজ সত্যিকার ঝড়ের দৃশ্যপট ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যদি সে অভিনয় করিত।

ঝড় আসিল। সারা গা'খানিকে যেন জোরে নোয়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চায়। সারা রাজ্যের ধূলিতে চারিদিক অন্ধকার। তার পরই তীক্ষ্ণধার বৃষ্টির আঘাত—বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ। জীবন তন্ময় হইয়া গেল। সে সেই ঝড় কাটিয়া বাতাসের, বৃষ্টির আর প্রকৃতির উন্মাদনার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে বাড়ীর দিকে ছুটিল। মাথার উপর বাজ ডাকিল, চারিপাশে গাছপালা ভাঙ্গিয়া পড়িল, বাড়ীর পথ ভাঙ্গা গাছবাঁশে রুদ্ধ হইয়া গেল, ঝড়ের দৃশ্যে অভিনেতা জীবন যেন সত্যিকার অভিনয়ে মাতিয়াছে।

স্বগৃহে যখন আসিয়া জীবন পৌঁছিল, তখন ঝড়ের রুদ্র তাণ্ডব অনেকটা থামিয়াছে কিন্তু চারিদিকে উঠিয়াছে আর্ত কোলাহল। জীবন আবার বারান্দা হইতে নামিল—মা ডাকিলেন, ওরে জীবনা—মাথা খা', যাস্‌নে। স্ত্রী ডাকিল, ওগো আবার যাচ্ছ কোথা?

মুখ না ফিরাইয়া জীবন উত্তর দিল, বিপন্নের আর্তনাদ শুন্‌ছ না তুমি মধু—

বিপন্নকে উদ্ধার করিতে গিয়া জীবন দেখিল, বসন্ত মুসলমান পাড়ার লোকগুলির উপরই দৃষ্টি দিয়াছিল, কিন্তু ঝড়ের উন্মাদ খেলায় অবশিষ্ট লোকগুলির আবাস গৃহগুলিও উড়িয়া গিয়াছে। মুসলমান পাড়ায় সকলের আশ্রয়লাভ সম্ভব হইল না, তাই তিনচারিটী গৃহহারা পরিবারকে জীবনকেই তাহার বাহিরের ঘরে আশ্রয় দিতে হইল। রাজা জীবন নিরাশ্রয়দেরে আশ্রয় না দিয়া পারে না, কিন্তু জীবনরাজার স্ব-সম্প্রদায়ের প্রজাবৃন্দ ইহা সহিতেও পারে না। তাহারা রাজারই বিচার করিতে বসিল এবং আদেশ করিল, স্বগৃহে মুসলমানদেরে আশ্রয়দানের জন্য জীবনকে সপরিবারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

জীবন বিস্মিত কণ্ঠে উত্তর করিল, কি বল্‌ছ তোমরা? তোমরা পুরাণের নির্দেশ, অতীতের অনুশাসন মান না? প্রায়শ্চিত্ত? যেদিন কলিঙ্গরাজ্যে বন্যা হয়েছিল, সেদিন রাজা শ্বেতকেতু স্পৃশ্য অস্পৃশ্য সর্বজাতীয় বিপন্ন প্রজার জন্য রাজপুরীর, রাজান্তঃপুরের দ্বার মুক্ত করে দিয়ে বলেছিলেন—

সকলে উৎকট হাসিতে ফাটিয়া পড়িয়া তাহাকে একঘরে অস্পৃশ্য হইয়া থাকিবার আদেশ করিল। ধর্মহানীর ভয়ে বামাচরণের বিধবা ভ্রাতৃবধুকে পর্যন্ত দোর্দণ্ড ভাসুরের গৃহেই প্রত্যাবর্তন করিতে হইল আর কিছুদিন পর জীবনের জননীর

মৃত্যু হইলে সেই মৃতদেহ জীবন একাকীই নদীতীরে বহন করিয়া লইয়া গেল, নিজেই চিতা সাজাইল। হিন্দুর শব-সংকারে সাহায্য মুসলমানের ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাই মুসলমান পাড়ার লোকেরা সহানুভূতিশীল হইলেও কাঠ-কোটা দিয়াও সাহায্য করিতে পারে না তো!

প্রেমদা জীবনকে প্রশ্ন করিয়াছিল ব্যাকুল কণ্ঠে, ওগো, তা'হলে কি হবে?

জীবনের বুকটা হঠাৎ ছাৎ করিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে যখন কণ্ঠ মুক্ত করিল, তখন সেই রাজার কণ্ঠ। সে বলিল, ভয় নেই, মধুচ্ছন্দা! আমি—ওই আমার মৃত জননীর পুত্র যে বেঁচে আছি। বাহুতে আমার শক্তি আছে, হৃদয়ে দৃঢ়তা আছে, মনে কর, আমরা বনবাসী।

শ্রাদ্ধবাসরেও জ্ঞাতিবন্ধুগণ জীবনকে বর্জন করিয়া রহিল। হিন্দুর শ্রাদ্ধবাসরে মুসলমান প্রতিবাসীরা কোন খাদ্য গ্রহণ করিবে, তাহাও কল্পনাতীত। তবে উৎসব একেবারে জনতা শূন্য নয়। যে জনতা তাদেরই, যাহারা শ্রেণীহীন, যাদের কোন জাতি নাই, বুঝিবা ধর্মও নাই—কোন বিত্ত নাই, তাই বোধকরি তাদের সমাজও নাই, অথচ উদরে আজন্ম অতৃপ্তি। তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জীবন মনে মনে আবৃত্তি করিল, হে দরিদ্র প্রজাকুল, তোমরা তৃপ্ত হও।

হরিশপুর নিত্যকার আভ্যন্তরীণ জীবন-যুদ্ধে ব্যস্ত।

রোগ আসে যায়। বিরাট মাঠের ক্ষেতে মাঝে মাঝে অজন্মা হয়, আবার প্রচুর ফসল জন্মে। বর্ষার বন্যায় একবার সারারাজ্যের জার্মান-পানা ভাসাইয়া আনিয়া গ্রামের চলাচলের পথ ঘাট খালনালা রুদ্ধ করিয়া দেয়, মাঠ ছাইয়া ফেলে, আবার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেও জলের অভাবে মাঠগুলি খা' খা' করিতে থাকে। বৃহৎ গ্রামখানি জুড়িয়া কখনো বা চুরি ডাকাতি বাড়িয়া চলে আবার দোর্দণ্ড প্রতাপশালী বিপুল দারোগার শাসনে তাহা থামিয়া পড়ে। এমনি করিয়া যখন জীবন-রাজার রাজ্য হরিশপুর কালের বুকে পথ কাটিয়া চলিয়াছে, তখন একদিন তাহার মাথার উপর দিয়া সারি বাঁধিয়া কয়েকখানি এরোপ্লেন সশব্দে উড়িয়া গেল।

হরিশপুর জানিত ওই কোন দূর মহাদেশ ইউরোপে যুদ্ধ বাঁধিয়াছে, তার উত্তেজনাও তাহারা একদা অনুভব করিয়াছে, আবার হরিশপুরের জীবন তেমনি চলিয়াছে। কিন্তু মাথার উপর দিয়া নিত্য যখন বিমান বহর আনাগোণা করিতে লাগিল তখনই তাহারা আরও উত্তেজিত হইয়া ভাবিল, সত্যই যুদ্ধ আসিয়াছে এবং এবার আর খুব দূরে আর নিশ্চয়ই নয়, একেবারে বাড়ীর কাছে।

প্রেমদা জিজ্ঞাসা করে, ওগো কি হবে ?

জীবন নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে, কি হবে আবার, যুদ্ধ হবে ? রাজা থাক্‌লে, রাজত্ব থাক্‌লে এমনি যুদ্ধ বাঁধেই।

অবশ্য যুদ্ধবার্তায় জীবন নির্লিপ্ত থাকিলেও নিজেদের জীবন-যুদ্ধে সে বেশীদিন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত নির্বিকার থাকিতে পারিল না। রাজপরিবার বাড়িয়াছে, ইতিমধ্যে একটী নিটোলদেহ রাজকুমারের জন্ম হইয়াছে। জ্ঞাতি কুটুম্ব ও স্বজাতীয়রা তাহাকে বর্জন করার পর তাহার বাড়ীতেই আশে পাশে অনেকগুলি গৃহহারা হাড়ি, ডোম, কৈবর্ত পরিবার এক একখানি চালা বাঁধিয়া আশ্রয় লইয়াছে। ইহারা জীবনের প্রজাকুল। ইহাদের গৃহে যেদিন অন্নাভাব, সেদিনও রাজা জীবন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। ইহাদের রোগে শোকেও তাহাকে দৃষ্টি দিতে হয়। তাই জীবন একদিন দেখিল, তাহার পৈত্রিক জমির ক্ষেতের ধান আর বছরে দু'চার মাসের নিজের রাজগিরীর মাশুলে আর চলিতেছে না।

আবার ইদানিং যে দলের সঙ্গে সে সংশ্লিষ্ট ছিল সেই দলের অধিকারীর বাড়ীতে গিয়া সে অল্প বিস্মিত হইল না। কয়েকটী মাসের ব্যবধানেই তাহার এতো পরিবর্তন অপ্রত্যাশিত। অধিকারীর পুত্রটী আসাম সীমান্তের কোথায় কোন রেল ষ্টেশনে চাকুরি করিত হঠাৎ একদিন সে পিতাকে রাশি রাশি টাকা পাঠাইতে আরম্ভ করিল। সুতরাং সেই হঠাৎ-আসা টাকা গুলির সুব্যবস্থা করিতে গিয়া অধিকারীর যাত্রাদলের দিকে মনোযোগ দিবার অবসর কোথায়? জীবন দেখিল, এমনি করিয়া মহাযুদ্ধের কোলাহলে সুয়োরাণী-দুয়োরাণী, মন্ত্রী-সেনা-

পতি, বিদূষক-ভগ্নদূত, সখী ও সহচরিগণ এমন কি মৃত সৈনিকেরা পর্যন্ত সকলেই কোথায় হারাইয়া গেছে—শুধু সে রাজাই অবশিষ্ট আছে।

উপার্জন জীবনকে করিতে হইবে সত্য, কিন্তু তা'বলিয়া সারাজীবন যে রাজা সাজিয়া কাটাইয়াছে, সে আজ যা' তা' করিতে পারে না। জীবনযুদ্ধ তাহাকে চালাইতে হইবে, কিন্তু সে যুদ্ধ হইবে রাজার মতো। তাই যুদ্ধের ফলে তাহার ভূসম্পত্তি একে একে হ্রাস পাইতে লাগিল।

কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, হরিশপুর ক্রমে ক্রমে এমন এক অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইল, যাহা জীবনের বাস্তব জ্ঞান, বুদ্ধি ও ধারণার অতীত। চালের দাম বাড়িল তড়িৎ-গতিতে, একে একে সমস্ত জিনিষ পত্র হইল, দুর্মূল্য দুষ্প্রাপ্য। দেশজোড়া যেন দুর্ভিক্ষের একটা করাল মূর্তি অজস্র বাহু বিস্তার করিতেছে। অথচ দেশে ধান চাল আছে, দ্রব্য সম্ভার আছে, সবই আছে। জীবন তাহার পুরাণ-গ্রন্থ আর নাটক-গুলি খুলিয়া বসিল। কই, রাজার ও রাজ্যের কোন কাহিনীতে তো এমন অবস্থায় রাজা থাকেন উদাসীন তাহা কোথাও লেখে নাই?

গ্রামের বিখ্যাত ধনী মহাজন ও বিরাট ক্ষেতের মালিক কৃপাময়ের কাছে গিয়া জীবন উপস্থিত হইল, ভট্টাচার্যি মশায়! গাঁয়ের লোকের দুর্দশা দেখ্ছেন কি?

তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া করুণ হাসি হাসিলেন, দেখ্‌ছি বই কি? দেখ্‌ছি আর ভাব্‌ছি। তাই স্থির করেছি একটা রিলিফ কমিটী গঠন কর্‌ব।

জীবন দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, পুরাণ কি বলে জানেন? বলে, যতদিন রাজকোষে অর্থ আছে, ভাণ্ডারে শস্য আছে, ততদিন রাজ্যের একটীও প্রাণী উপবাসে থাকৃতে পারে না। আপনি তো এদেশের রাজা সদৃশ, আপনার ভাণ্ডার শস্যে পরিপূর্ণ—

ভট্টাচার্য হাসিলেন, রাজা ত তুমি, জীবন রাজা!

জীবন বলিয়া চলিল, রাজা যদি প্রজাদের জীবন সম্পর্কে উদাসীন হন, তা'হলে রাজ্যে বিদ্রোহ হয়, রাজকোষ শস্যভাণ্ডার লুন্ঠিত হয়।

পরদিন থানার বিপুল দারোগা জীবনকে ডাকিয়া নিয়া বলিলেন, ওহে রাজা, রাজদ্রোহের শাস্তি কি জান তো?

জীবন সহজকণ্ঠে উত্তর দিল, রাজদ্রোহ কোথায় দারোগা বাবু?

দারোগা বাবু এইবার উগ্র হইয়াই উঠিলেন, ভট্টাচার্যি মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়ে কি বলে শাসিয়ে এসেছো? সাবধান করে দিচ্ছি, নইলে রাজার হাতে হাতকড়ি পড়বে। বৃটীশ রাজ্যে ওইসব পৌরানিক রাজাদের গ্রাহ্য করা হয় না।

দারোগা হো-হো করিয়া হাসিয়া বিপুলবেগে উঠিলেন, থানার জমাদার কনেষ্টবলেরাও কেহ কেহ সরবে আর কেহ কেহবা

নীরবে স্ব-স্ব পদমর্যাদানুরূপ সে-হাসিতে যোগ দিল।

বল্লিপাড়ার হাটের খোলা ময়দানে সভা বসিল। সহর হইতেও কেহ কেহ আসিয়াছেন। গ্রামের মাতব্বরেরা, হাই স্কুলের শিক্ষকেরা, ছাত্রেরা, বাজারের ব্যবসায়ীরা সভায় সমবেত হইলেন। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন, স্বয়ং কৃপাময়। সহরের নেতা দীর্ঘকাল বক্তৃতা করিয়া আগত ও আসন্ন দুর্ভিক্ষের দিনের জন্য গভীর আশ্বাসের, জীবনের, আত্ম-প্রত্যয়ের বাণী উচ্চারণ করিলেন,—বলিলেন, আমরা দেশের লোক বেঁচে থাক্তে কি আমাদেরই প্রতিবেশী এদেরে মর্‌তে দিতে পারি? সে-যে হবে দেশের কলঙ্ক, জাতির কলঙ্ক, মনুষ্যত্বের কলঙ্ক। সে সভায়ই কৃপাময়কে সভাপতি করিয়া একটী রিলিফ কমিটীও গঠিত হইয়া গেল।

কিন্তু তথাপি জীবন দেখিল, শুধু কৃপাময়ের শস্য-ভাণ্ডারেই নয়, আরও অনেকের গোলায়ই প্রচুর ধান জমা হইয়া আছে, অথচ অন্নাভাবে গ্রামের অনেকগুলি লোক গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়াছে, নিরুদ্দেশের পানে। ইহারাই কিছুকাল আগে গ্রামের মাঠ হইতে ওই শস্যগুলি আহরণ করিয়াছিল।

জীবন বাধা দিতে গেল, নাটকীয় ভাষায় বক্তৃতা করিল, স্বদেশেই যদি তোমাদের অন্ন না জুটে, তা'হলে কোথায় জুটবে? তোমরা ফিরে এস—

অনাহার-শীর্ণ কঙ্কালগুলিতেও যেন বিদ্রূপের অফুরন্ত

উচ্ছ্বাস। একজন হাসিতে সারা দেহের হাড় বাঁকাইয়া বলিল, এখনো ওর পাগলামী গেল না, রাজা জীবন! আরে মোর রাজা রে—!

বিছানায় পড়িয়া জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে প্রেমদা বলে, ওগো, চল, এ গাঁ' ছেড়ে চলে যাই। এখানে থাক্‌লে—

অন্ধকার গৃহ। সারা রাত্রি আলো জ্বলিবে এমন কেরোসিন জুটানো আর সম্ভব নয়। সেই আঁধারেরই মাঝে প্রেমদার মুখের দিকে জীবন দৃষ্টি প্রসারিত করে। তারপর নিঃশব্দে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়।

ওপাশে শিশু রাজকুমার কোঁকাইয়া কাঁদিয়া উঠে, জীবন তাহাকে কোলে তুলিয়া লয়, বুকে চাপিয়া ধরে। উঃ, তার গা'ও যে পুড়িয়া যাইতেছে! তাহারও জ্বর আসিল?

জীবন সেই আঁধারেই ঘর হইতে বাহির হইল। বাহিরেও আঁধার। গ্রামের ঘন ঝাড়ঝোপ যেন আঁধারের সঙ্গে মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেছে। বাড়ীর কোণের ছাতিম গাছটী হইতে একটী পাখী ডাকিয়া উঠিল, কু-কু-কু। গাঁয়ের লোক বলে, অলক্ষুণে 'কুলি' কু-দেখিলে ডাকে কু-কু। রাত্রেই ইহারা জাগে, আঁধারেই ইহারা কুৎসিতকণ্ঠে ডাকিয়া মানুষের মনে ভয় জাগায়।

নিশাচর পাখী, পেচক, কুলি,। জীবন একটি ঢিল লইয়া ওই গাছের উপর ছুড়িয়া মারিল। তথাপি থাকিয়া থাকিয়া পাখীটা ডাকিতে লাগিল, কু—কু—কু।

বাড়ীর বাহিরের পথ ধরিয়া আঁধারেই জীবন আগাইয়া চলিল। দু'ধারে বন-জঙ্গল, বেতকাঁটার গাছ আর বাঁশের ঝাড়। মাঝে মাঝে জার্মাণী-পানা ভরা ডোবা। বাড়ীগুলি তাহারই মাঝে হারাইয়া আছে। দিনের বেলাও একটা স্যাঁৎ-স্যাঁতে শীতলতা, রাত্রের আঁধারে তো গা' শিরশির করিয়া উঠেই। ঝি ঝিঁ পোকা একস্বরে অবিশ্রান্ত ডাকিয়া চলিয়াছে। জঙ্গলের মধ্য হইতে একটা নিম্‌পাখী ভয়-জাগান কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, নি-ইম্—নি-ইম্। শেয়াল আর ডাকে না, সন্ধ্যায় ডাকিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে। বোধকরি তাহাদেরও মহামারীতে মহোৎসব লাগিয়াছে, তাই ডাকিতে ভুলিয়া গিয়াছে অথবা সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

হরিশনগরে শুধু দুর্ভিক্ষই নয়, সবান্ধব মহামারীও। জ্বরের মহামারী। কোথায় কোন পার্বত্য অঞ্চলে কাহারা অর্থের সন্ধানে গিয়াছিল, অর্থ নিয়াই শুধু ফিরিয়া আসে নাই, মৃত্যুও লইয়া অসিয়াছে।

প্রথম রাত্রিতেই মহামারীক্লিষ্ট গাঁ' খানি নীরব। পূর্বে মহামারী দেখা দিলে সরবতা বৃদ্ধিই পাইত। হিন্দু পাড়াগুলি প্রতিরাত্রে কীর্তনে মুখর হইয়া উঠিত। মুসলমান পাড়ায়

আরম্ভ হইত 'জারি পিটা,' সিন্নি, 'ভাব্না,' পীরের ঝাড়্ফুক, তুক্তাক। গাঁয়ের ঈশান কোণে বাঁশ পুতিয়া, সীমানা কাটিয়া 'দেও' কে ঠেকাইয়া তফাৎ রাখা হইত। এইবার জ্বরের মহামারী, মহাযুদ্ধের মহামারী সব-কিছু ভুলাইয়া দিয়াছে। হরি ও পীর দু'জনই পরাস্ত হইয়া বিদায় হইয়াছেন। সারাগ্রাম যেন হৃতবল, বোধশক্তিহীন, মূহ্যমান। জানে কাৎরাইতে আর মরিতে। শুধু মাঝপাড়ার বীরু চক্রবর্তী নূতন জ্বরের প্রকোপে গান-গাহিয়া, বক্তৃতা করিয়া, স্ত্রী পুত্রকে সাধু ভাষায় গালাগাল দিয়া জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে।

জীবন চলিয়াছে ডাক্তারখানার দিকে। তাহার শিশু-পুত্রটীর, রাজকুমারের গা' পুড়িতেছে। তাহাকেও মহামারীতে ধরিয়াছে ?

ডাক্তারখানার পাশেই নিজের বাসাবাড়ীর ছোট্ট বৈঠক-খানাটীতে ডাক্তারবাবু আরো কয়জনকে লইয়া তাসের আসর বসাইয়াছেন। ডাক্তারবাবুর হাতে তাস, দৃষ্টি সেগুলির উপরই নিবদ্ধ, কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি একটা তর্কের জের টানিয়া খাপছাড়া ভাবে বলিয়া চলিয়াছেন, দুত্তোর তোর সেরিব্রো-স্পাইনেল। হুঁ—স্পেড্। আমরা জানি বাবা ম্যালেরিয়া—গা'কাপুনি, জ্বর, ঘাম—থ্রি নট্রাম! তা' নয় সেরিব্রো স্পাইনেল ফিভার, লাম্বার পাংচার—বাঃ ব্বাঃ! কি ? তুমি কি ডাক্লেহে—ফোর হার্ট্স্? তা'হলে—তাহলে—লাম্বার পাংচার—মোনিঙ্গো কক্কাই—ডাবল।

জীবন ডাকিল, ডাক্তার বাবু!

ডাক্তারবাবু বলিলেন, হ্যাঁ, ডাবলই রইল।

জীবন ডাকিল, ডাক্তার বাবু! শুনুন।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, তারপর?

জীবন এইবার বলিল, রাজ্যজোড়া এই যে মহামারী—আপনি রাজকর্মচারী, রাজপ্রতিনিধি।

ডাক্তারবাবু হাতের তাস রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর দরজাখানি সশব্দে বন্ধ করিয়া কহিলেন, হুঁ, রাজা জীবন এসেছেন! কাল এসো বাপু ডাক্তারখানায়, শিশি ভরে কুইনিন নিয়ে যেয়ো।

একজন খেলোয়াড় মন্তব্য করিলেন, জল বলুন।

ডাক্তারবাবু বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, এ-ই যে পাওয়া যাচ্ছে, সৌভাগ্যের কথা—রাজানুগ্রহ।

জীবন সেবা সমিতির কেম্পে গিয়া উপস্থিত হইল। সাত-আনি জমিদারী কাছারীর বাহির বাড়ীতে একখানি টিনের চালাঘরে এই কেম্প। ছোট ঘরখানিতে দশবারোটী ছেলে গাদাগাদি করিয়া বাস করে। একখানা কাঠের ছোট তক্তপোষ, একটা বাঁশের মাচা আর মাটীতে বাঁশের চাটাই বিছাইয়া ঢালা বিছানা। পেছনে ছোট একখানি চালায় তাহাদের রান্না চড়িয়াছে। তক্তপোষের উপর গায়ে কম্বল চাপাইয়া একটি ছেলে জ্বরে কাঁপিতেছে আর উচ্চ-কম্পিত

বেসুরো কণ্ঠে স্বদেশী গান গাহিতেছে। সেবাকার্য্যে নবাগত তিনটী ছেলে ধরিয়া বসিয়াছে—এই কাদা, জার্মেণী পানা, বন জঙ্গল আর অগণিত বারমেসে মশামাছির রাজ্যে তাহারা টিকিতে পারিবে না, কাল সকালেই তাহারা সহরে ফিরিয়া যাইবে।

জীবন গিয়া ডাকিল, বাবু!

সেখানকার সেবাদলের কর্তা উত্তর দিলেন, কে?

একজন সেবক চাপাকণ্ঠে কহিল, জীবন রাজা।

জীবন উত্তর করিল, আমার ছেলেটারও জ্বর এল বাবু! কেউ আর বাকি থাক্‌বে না।

সেবাদলের কর্তা প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, এরই মধ্যে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে যে।

জীবন শুধু উচ্চারণ করিল, সংগ্রাম?

সেবাসমিতি সেরাত্রের জন্য কতকগুলি এন্টিম্যালেরিয়েল পিল দিতে চাহিল। কিন্তু এন্টিম্যালেরিয়েল পিল দিয়া কি হইবে? গাঁয়ের কতো লোক তো খাইল, তথাপি মরিল; প্রেমদা ডাক্তারখানার কতো কুইনাইনই গিলিয়াছে, কই, এখনো বিছানায় পড়িয়া আছে। গাঁয়ের লোক এখন 'পিলে'র চোরা বাজার খুলিয়া বসিয়াছে।

জীবন ফিরিয়া চলিল। পাড়ার পর পাড়া মহামারীতে মরিয়া আছে। যাহারা মরিবে তাহারা অন্ধকার গৃহে পড়িয়া

ক্ষীণকণ্ঠে কাৎরাইতেছে। অনেকগুলি বাড়ীর পেছনে সম্মুখে শ্মশানের উপর শ্মশান, কবরের পাশে কবর। একজায়গায় কয়েকটি শেয়াল কি নিয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে, মাঝে মাঝে খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করিয়া খেঁকাইতেছে, গোঙ্‌রাইতেছে। কারো শবদেহ মাটী খুঁড়িয়া তুলিয়াছে কি ?

করিম বিশ্বাসদের মজা পানাপুকুরের পাড় দিয়া দুর্গন্ধে চলা যায় না। সেই পানার নীচে কয়টি মৃতদেহ পচিয়া এই দুর্গন্ধ ছড়াইতেছে, কে জানে ?

ঠাকুরপাড়া আর মাঝপাড়ার মধ্যেকার এই খোলা জায়গাটুকুতে বড় বুড়ো বটগাছটীতে পাশাপাশি থাকেন, কালভৈরব আর কালাচাঁদ ! পাশের শেওড়া গাছটীতে রূপসী। সারা গাঁয়ের লোক তাঁহাদেরে পূজা করে, মান্যকরে। কালভৈরব ও কালাচাঁদ পান সেবা ও লুট। রূপসীর কাছে নূতন সন্তানের জন্মে, বিবাহে মেয়েরা গান গাহিয়া ভেরুয়া সাজাইয়া পূজা দেয়। রাজকুমারের জন্মেও সেখানে রাজোচিত সমারোহে ভেরুয়া সাজাইয়া দিয়াছিল প্রেমদা। সেদিন ঢোল কাঁসি বাজিয়াছিল। আজ কি ইহাদের কাছে জীবন মানত করিবে, পুত্রের প্রাণভিক্ষা চাহিবে—সেবা, লুট, পূজা ? না, না, সে জীবনরাজা, নিজের শক্তি দিয়াই সে পুত্রকে রক্ষা করিবে।

কারা দু'জন চুপি চুপি চলিয়াছে। সন্দেহ হয়। জীবন হাঁক দিল, কারা, কারা যায় ?

একটী লোক উঠি-পড়ি করিয়া পলাইয়া গেল, একজনকে জীবন চাপিয়া ধরিল। ইহাদের পশ্চাতে আরও দু'টী প্রাণী ছিল, আঁধারেও বোঝা যায় তাহারা মেয়েলোক। ধৃত লোকটী হারু ধর। জীবন শুনিয়াছিল দুর্ভিক্ষ ও মহামারী তাহার ব্যবসার সুযোগ করিয়া দিয়াছে, মেয়েদের গোপন ব্যবসা। আর শুধু মেয়েই নয় অনেক অনাথ শিশুও নাকি সে দূরে নিয়া বিক্রয় করিয়াছে। স্থানীয় রাত্রির ব্যবসা, এ তো সামান্য।

জীবন হারু ধরকে ধরিয়া জোরে ঝাঁকাইয়া দিল। তারপর ধাক্কা দিয়া দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া চলিয়া গেল। আজ আর কিছু করিবার, প্রহারের বা শাসনের প্রবৃত্তি তাহার নাই।

বাড়ীতে আসিয়া যখন সে উপস্থিত হইল, তখনও ছাতিম গাছ হইতে সেই নিশাচর পাখিটী তেমনি অবিরাম ডাকিতেছে কু—কু—কু।

কিন্তু সকলের জীবনেরই একদিন শেষ আছে।

জীবন রাজার রাজকুমার একদিন রাত্রিকালে ধীরে ধীরে স্তব্ধ হইয়া পড়িল। জীবন চোখ চাহিয়া স্পষ্ট তাহা দেখিল! সেরাত্রে ঘরে আলো ছিল, সেবাসমিতির দেওয়া কেরোসিনের আলো।

রাজকুমারের এই মৃত্যু জীবনকে এক রূঢ় আঘাতে যেন হতচেতন করিয়া দিল। শীর্ণদেহা জননীর কোলে পুত্রের মৃতদেহ, তাহার পাশে দাঁড়াইয়া আছে পিতা। এ যেন শ্মশানে শৈব্যা, আর সে হরিশ্চন্দ্র। আজ মৃতপুত্রকে চিনিতে ভগবানের কাছে বিদ্যুৎ ভিক্ষা করিতে হয় না। সে চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্র, এখনই তাহাকে এই শিশুদেহের সৎকার করিতে হইবে।

কতক্ষণ পর জীবন যেন এক অভিনব চেতনা ফিরিয়া পাইল। সে একখানা কোদাল নিয়া আসিয়া ঘরের মেঝে খুঁড়িতে আরম্ভ করিল।

প্রেমদা ভাবিল, জীবন কি উন্মাদ হইয়া গেল ? সে কাতর কণ্ঠে ডাকিল, ওগো, এসব কি করছ ?

জীবনের কোদাল থামে না। সে বলিয়া চলে, সে রাজপুত্র, কোথায় যাবে সে ? এই গৃহেই তো থাকতে এসেছিল, এ-গৃহেই সে থাকবে।

তারপর সে আরম্ভ করিল যাত্রাভিনয়ের 'মেড্‌সিনে'র অভিনয়। রাজারা সব উন্মাদ হইয়া গেছেন, চারিদিকে বিভীষিকা দেখিতেছেন। তাহার জীবনের অভিনীত ভূমিকার কত রাজা। কোদাল হাতে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া জীবন রাজার পার্ট করিতে লাগিল।

প্রেমদা তাহার দেহকঙ্কালকে কোন রকমে খাড়া করিয়া তুলিল। সে জীবনের হাত ধরিয়া বলিল, ওগো, তুমি কি

পাগল হয়ে গেলে? তুমি যে রাজা! রাজা কি কখনো পাগল হয়? তাঁর যে কতো কাজ?

রাজা! কতো কাজ? জীবন হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল, হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিতে লাগিল, সত্যি মধুচ্ছন্দা! শ্বেতকেতুর রাজ্যে অনশন—মহামারী। শ্বেতকেতু তা' রোধ করতে পারেন না। তার পুত্র মরে, প্রজা শ্বেতকেতুকে আত্মদান করে মরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। রাজা যদি পাপী না হয়, তবে তার রাজ্যে এসব অঘটন ঘটবে কেন?

জীবন থামিল। প্রেমদা তাহাকে বাহুর কঙ্কাল মেলিয়া জড়াইয়া ধরিল। জীবন আবার কহিল, অনাচার অত্যাচার বলেই তো রাজপুত্রের মৃত্যু হয়। জান, শ্বেতকেতু আর মধুচ্ছন্দা বারুণীর জলে জীবন বিসর্জন দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়েছিলেন, স্বয়ং ভগবান এসে দেখা দিলেন, আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল, কলিঙ্গরাজ্য থেকে দূর হল বিধাতার অভিশাপ, রাজার অজ্ঞাত পাপের রাজধর্ম্মচ্যুতির অভিশাপ।

বলিতে বলিতে জীবন যেন অন্য কোন রাজ্যে চলিয়া গেল—তারপর অকস্মাৎ চেতনাশূন্য হইয়া ঢলিয়া পড়িল। প্রেমদা তাহাকে যেমন জড়াইয়া ধরিয়াছিল, তেমনি রহিল। জীবন-প্রেমদার জড়াজড়ি গায়ের ধাক্কায় করোসিনের বাতিটী উল্‌টিয়া পড়িয়া গেল, আর প্রদীপের আগুন কেরোসিন বাহিয়া কাপড় বিছানায় ছড়াইতে লাগিল।

বিছানার উপর তখনও রাজকুমারের মৃতদেহ।

* * * *

রাত্রি শেষে জীবনদের বাড়ীর ভস্মস্তূপের অগ্নিও ঝিমাইয়া আসিয়াছে। শুধু বাতাসে মাঝে মাঝে ভস্মকণা উড়িয়া আকাশ পথে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। যে-ক'জন প্রতিবেশী ইতিপূর্বে আসিয়া সমবেত হইয়াছিল, তাহারাও কবেই চলিয়া গেছে। শুধু পোড়া মাংসের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া দূরে দুইটা শেয়াল আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহাদের দু'জোড়া চোখ আঁধারে জ্বলিতেছে।

আর—ছাতিম গাছে আবার সেই পাখিটা ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে—কু—কু—কু। তাহার কি ভাষা আছে, সে কি বলিতেছে?

জীবন রাজার মৃত্যু হইয়াছে, রাজা দীর্ঘজীবি হোন?

জন্মদিন

তেরোশ পঞ্চাশের তেরোই মাঘ। স্থচরিতার জন্মদিন।

একুশবার এই দিনটী আসিয়াছে, গিয়াছে। স্থচরিতা দিনটীকে বারবারই স্মরণ করিয়াছে। তাহার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবী কেহই ভুলে নাই। কিন্তু স্থচরিতা এমন কেউ নয়, যাহার জন্মদিনকে জাতির বা সমাজের ইতিবৃত্তে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিতে হইবে।

তবে হরিপদ বিগত কয়টী বছর স্থচরিতার জীবনের এই বিশেষ দিনটীকেও জীবনের খাতায় এমন করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছে, বুঝিবা এই মেয়েটী একেবারে সাধারণ নয়।

হরিপদের জীবনে অসাধারণ সেই স্থচরিতার জন্মদিন আবার আসিতেছে। তেরোশ পঞ্চাশের তেরোই মাঘ।

হরিপদ শিক্ষিত, স্থন্দর। হরিপদ সংস্কৃতিশীল তরুণ। হরিপদ রাজনৈতিক প্রগতিবাদী, উচ্চ আদর্শের পূজারীও।

হরিপদের পিতা রায় বাহাদুর। ঘটনাবহুল কর্মজীবনের

অবসানে অবসরপ্রাপ্ত রায় রাহাদুর হরিহর রায় চৌধুরী। পিতা কৃতীত্বের সহিত ত্রিশ বৎসর কাল সরকারী দপ্তরে কার্য করিয়া শুধু উপাধি নয়, অর্থ ও প্রতিপত্তিও অর্জন করিয়াছেন। পুত্র ষোল বৎসর কালের বিদ্যার্থী জীবনে যশঃলাভ করিয়াই শুধু ক্ষান্ত থাকে নাই, ন্যায়নিষ্ঠা ও সত্যপ্রিয়তায়, অকুণ্ঠ নির্ভীকতা ও মানসিক বলিষ্ঠতায় বন্ধুবান্ধব ও সহপাঠী মহলে খ্যাতিলাভ করিয়াছে এবং দেশসেবার উচ্চ আদর্শকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকেই জীবনে সত্য করিয়া তুলিবে অন্য দশটী তরুণের মতো এই সংকল্পও অনেকবার তাহার অন্তরে উচ্চারিত হইয়াছে।

কিন্তু রায়বাহাদুরের কর্মময় জীবনের প্রেরণা—হরিপদের আদর্শ-উদ্‌যাপনে যেন বিঘ্নই হইয়া দাঁড়াইল। জীবনের ত্রিশটী বছর যে কাটাইল শুধু কাজে আর কাজে; কোথায় আসাম সীমান্তের হিংস্র বন্য প্রদেশ আর কোথায় সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা পুণ্যভূমি, কোথায় বিহারের উষ্ণ হাওয়া আর পলাশ মহুয়ার ফুলে-ছাওয়া পাহাড়ী প্রান্তরের রুক্ষতা আর কোথায় দার্জিলিংয়ের শীতার্ত রক্তিম সজীবতা। বাংলা বিহার ও আসামে ছুটাছুটী করিয়া কাটাইয়া কলিকাতায়ই একদিন হরিহর জীবনের স্থিতি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন, লাভ করিয়াছিলেন সম্মান ও পুরস্কার, সম্পদ ও আভিজাত্য। এই যাঁহার জীবন তিনি প্রৌঢ় বয়সেও তেতলার প্রাসাদ-কক্ষে বসিয়া শুধু ব্যাঙ্কের খাতা আর পরিবার পরিজনকে পাহারা দিয়াই জীবন কাটাইতে পারেন না।

রায়বাহাদুর তাই আবার কর্ম্মজীবনকেই বরণ করিয়া লইয়াছেন এবং এইবার রাজধানীর রাজহর্ম্যে বসিয়া নির্বিকারচিত্তে লোভনীয় উচ্চ রাজকর্ম করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন।

সেদিন অপরাহ্ণে স্বগৃহে আরাম কেদারায় গা এলাইয়া রায়বাহাদুর বিশ্রাম করিতেছিলেন। হরিপদ গিয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেই একখানা চেয়ার দেখাইয়া আদেশ করিলেন, বস।

হরিপদ দাঁড়াইয়া রহিল। পিতার সম্মুখে চেয়ার টানিয়া বসিবে এই শিক্ষা তাহার নাই।

রায়বাহাদুর একবার পুত্রের দিকে প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়াই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, অবশেষে গভীর কণ্ঠে কহিলেন, তারপর কি করবে স্থির করলে তুমি ?

হরিপদ উত্তর করিল, আপনি যা'—

রায়বাহাদুর এইবার সোজা হইয়া বসিয়া একটা সিগারেট ধরাইলেন—কহিলেন, থামলে কেন ? দেখ, মুখে যতোই বলতে চাওনা কেন, আমি যা'বলব, তা'তেই আজকার যুগের এম-এ পাশ ছেলে তুমি নিরাপত্তিতে সায় দিয়ে যাবে, তাই কি আমাকে ভাবতে হবে ?

হরিপদ কহিল, আপনি আমাকে তো অন্যায় কিছু করতে বল্‌বেন না ? তাই—

রায় বাহাদুর কহিলেন. আমি জানি চাকরীর প্রতি তোমার একটা ঘৃণা আছে কেন এ ঘৃণা, তার সত্যিকার কোন কারণ

আছে কি না, সে তর্কে প্রয়োজন নেই। তবে আমিও চাইনে যে তুমি চাকরী কর।

হরিপদ ভাবিল, বহুদর্শী পিতা তাহার মনের কথা সত্যিই উপলব্ধি করিয়াছেন।

পিতা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তুমি হাত পা গুটিয়ে বসে থাক্‌বে, অথবা কংগ্রেস, সাহিত্যসভা, সংস্কৃতিসংঘ আর ওই কি-সব সেবাদলে গিয়ে আড্ডা মেরে সময় কাটাবে তাও আমি চাই না। তুমি হয়ত প্রতিবাদ করবে, কিন্তু বিতর্ক সভায় যুক্তিজাল বুনে সাহিত্যও হয় না, সংস্কৃতিও নয়—দেশবাসীর সেবা তো নয়ই। তুমি দেশের সেবাই কর আপত্তি নেই, তবে সত্যিকার কাজ করে। মনে রেখো, আজ যদি দেশে প্রচুর ধান চাল, ডাল, চিনি, কাপড় চোপড় আমদানী না হয়, তা'হলে শুধু সেবক সেজে হল্লা করলেই কি তোমরা দেশের লোকের অভাব ঘুচাবে? ফুলিশ!

এ যুক্তির প্রতিবাদ হৃদয়ে জমা হইয়া ছিল, কিন্তু পিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হরিপদ ভাবিতে বাধ্য হইল, হয়তো ইহাই সত্যি।

কিছুক্ষণ থামিয়া রায়বাহাদুর সিগারেট টানিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের সম্মুখ ভাগে সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া যেন একটা রহস্যের গোলকধাঁধা সৃষ্টি করিতেছিল। আর সেই

ধাঁধার মাঝে স্তব্ধ নির্বাক হরিপদ যেন ক্রমশঃপথ হারাইয়া তলাইয়া যাইতেছিল।

সিগারেটের দগ্ধাবশিষ্ট অংশটা এস্‌ট্রেতে চাপিয়া থেৎলাইয়া রায়বাহাদুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। টেবিলের উপর হইতে একখানা বন্ধখাম লইয়া হরিপদের হাতে দিয়া বলিলেন, আজই সাতটায় ওরিয়্যাণ্টেল বিজনেস্ সিণ্ডিকেটের মিঃ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে দেখা করে এখানা তাঁর হাতে দিয়ো। হ্যাঁ, কিছু তোমাকে বল্‌তে হবে না। এর মাঝে যে টাইপ-করা কাগজখানা আছে, সেখানা দেখলেই তিনি বুঝ্‌বেন।

সেদিন রাত্রেই হরিপদ ওরিয়্যাণ্টেল বিজনেস্ সিণ্ডিকেটের অংশীদার ও সিকিওরিং ম্যানেজার হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। মা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিয়ছিলেন, বোন নমিতা মাথা হেলাইয়া নাটকীয় ভঙ্গীতে 'কন্‌গ্রেচুলেশন' জানাইয়াছিল, আর পিতার মুখে ক্ষণেকের জন্য এক ঝলক্ হাসি খেলিয়া গিয়াছিল। হরিপদ ভাবিতেছিল, সে নিশ্চয়ই অপ্রত্যাশিত একটা কিছু করিয়াছে, নইলে চিরকালের হাস্যকৃপণ তাহার পিতার মুখেও হাসি ফুটিয়া উঠিত না।

সুচরিতাও হাসিয়াছিল। বলিয়াছিল, আমি জান্‌তামই আর বিস্ময়কর একটা-কিছু না-করে তুমি ছাড়বেই বা কেন?

হরিপদ উত্তর দিয়াছিল, এবারকার তোমার জন্মদিনটা হোক আরও বিস্ময়কর।

তেরশ পঞ্চাশের তেরোই মাঘ—সুচরিতার জন্মদিন আসিয়া উপস্থিত হইল,—কিন্তু—

কিন্তু হরিপদ সেদিনটীতে সুচরিতাদের গৃহে আসিয়া দেখা দিল নূতন মূর্তিতে। তাহার সে অন্তর যেন কোথায় হারাইয়া গেছে, সে উৎসাহ, সে উদ্দীপনা, এই দিনটীর জন্য সেই আকুল প্রতীক্ষা যেন আর অবশিষ্ট নাই।

চার বছর আগে এই দিনটীতেই উৎসব শেষে নিরালায় দুজনে পরস্পর বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সমস্ত জীবনই তাদের সেদিনকার সে-বন্ধন অটুট হইয়া থাকিবে।

ইহার পর প্রতিটী তেরোই মাঘে যে-কোন সুযোগেই একবার করিয়া হয় হরিপদ না হয় সুচরিতা একে অন্যকে স্মিতহাস্যে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে, আজ তেরোই মাঘ।

কিন্তু এই তেরোই মাঘ এগারোটায় ওরিয়্যাণ্টেল বিজনেস্ সিণ্ডিকেটের সিকিওরিং ম্যানেজার মিঃ এইচ, পি, রায়চৌধুরী অর্থাৎ হরিপদ সরকারী দপ্তরে গিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন চিনির কণ্ট্রাক্ট বিলি হইবে। পাঁচ লক্ষ টন চিনি এপ্রদেশে আসিবে বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতে। মস্তবড় কণ্ট্রাক্ট। প্রতিযোগীও অনেক। মিঃ ভট্টাচার্য বলিয়াছিলেন, আপনাকেই যেতে হচ্ছে মিঃ চৌধুরী—এখানকার চার্জ আপনাকেই নিতে হবে কিনা? আমি যাচ্ছি বোম্বাই আর মিঃ আলম আসামের

দিকে। তা' এখন থেকে যদি আলাপ, পরিচয়—অভিজ্ঞতা—

হরিপদ মিঃ ভট্টাচার্যকে বলিয়াছিল, আমরা টেণ্ডার দিয়েছি, যদি কণ্ট্রাক্ট পাই তাহলে তো অমনি ওরা জানাবে, গিয়ে কি হবে?

মিঃ ভট্টাচার্য হাসিয়াছিলেন, দেখুন মিঃ রায়চৌধুরী, এ শুধু টেণ্ডারের নয়, কাড়াকাড়ির, অনেকখানি হাঙামা হুজ্জতের ব্যাপার। আপনাকে কেড়ে আনতে হবে যে। আর শুনুন, আমাদের কেশিয়ার বাবুও সেখানে উপস্থিত থাকবেন টাকা নিয়ে। যা' প্রয়োজন হবে, তাঁর কাছে পাবেন। আপনার ফুল অথরিটী—যা' লাগে খরচ করবেন। কণ্ট্রাক্ট যদি সিণ্ডিকেটের নামে না দিয়ে জনসেবা সাপ্লাই কোম্পানীর নামে দেয় তাতেও বাধা নেই, ওটাও আমাদেরই।

কিন্তু টাকা কেন? হরিপদ বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

মিঃ ভট্টাচার্য এবার অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়িলেন, কিন্তু টাকা কেন? প্রয়োজন বলে!

কণ্ট্রাক্টবিলি দপ্তরের চারতলার উপরের ওয়েটিং রুমে অপেক্ষমান নীরব জনতাটী ছোট নয়। সব জাতের লোকের সমাবেশ। মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, সিন্ধি, গুজরাটী, মারাঠী, বোম্বাইওয়ালা, বিহারী, বাঙালী—রবীন্দ্রনাথের ভারততীর্থের মিলন যাত্রীরা এই ওয়েটিং লিস্টে কোন মহান লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য উন্মুখ হইয়া নাম লিখাইয়াছেন।

ইতিমধ্যেই ব্যবসা জগতে বুঝিবা সে প্রায় পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। তাই হরিপদকে দেখিয়া সেই জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল, নীরব দৃষ্টি-চাঞ্চল্য। কিছুক্ষণ পর বোম্বাই-ওয়ালাটী আসিয়া তাহার নামের একখানা কার্ড হরিপদর হাতে দিয়া কানে কানে বলিলেন, মিঃ রায়চৌধুরী যদি একবার তাহার সঙ্গে দেখা করেন, তাহা হইলে তিনি কৃতার্থ হইবেন। প্রায় সকলেই নীরবে তাহাকে নিজেদের নামের কার্ড অথবা কানে কানে মৌখিক পরিচয় দিয়া চরিতার্থ হইলেন। কিন্তু যখন ভিতর হইতে তাহার আহ্বানই সকলের আগে আসিল, তখন সকলেরই দৃষ্টি তীব্র, তীক্ষ্ণ হইয়া তাহাকে নূতন করিয়া বিঁধিতে লাগিল।

প্রথমেই তাহার সাক্ষাৎ হইল দপ্তরের বড় সাহেবের সঙ্গে। তিনি তাহার অভিবাদনের উত্তরে একবার চোখ তুলিয়াই উচ্চারণ করিলেন, গুড মর্ণিং। তারপর অনেকগুলি সই সারিয়া বৈদ্যুতিক ঘণ্টা টিপিয়া রিভলভিং চেয়ারখানিতে একবার ঘুরিয়া লইয়া পিছনদিকে কাত হইয়া ঝুঁকিতে লাগিলেন। আর্দালী আসিয়া উপস্থিত হইতেই বড় সাহেব আদেশ করিলেন, ছোট সাহেবকো কামরামে—। হরিপদ আর্দালীর সঙ্গী হইয়া বড় সাহেবকে আবার অভিবাদন করিল, সাহেব মৃদুহাস্যে কহিলেন, wish you good luck boy !

ছোট সাহেব তাহারই পিতা রায়বাহাদুর হরিহর। হরিপদ গিয়া বিস্ময় ও সঙ্কোচে হতবাক হইয়া সেখানে দাঁড়াইল।

রায়বাহাদুর পুত্রের মুখের দিকে চাইতেই, টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। তিনি রিসিভার হাতে লইয়া কিছুক্ষণ কি শুনিলেন, তারপরই ডানহাতে রিসিভারের মুখ চাপিয়া ধরিয়া আর্দালীকে আদেশ করিলেন, ওকে দশ নম্বরে নিয়ে যাও।

দশ নম্বরে গিয়া হরিপদ যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। এখানকার ভদ্রলোকটী স্যুট পরা হইলেও উঠিয়া ঠিক বাঙালী অন্তরঙ্গ ভাবেই তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন, আসুন, আসুন মশায়, নমস্কার। আপনি মিঃ রায়চৌধুরী? বসুন, বসুন।

হরিপদ এতোক্ষণ এই অফিসচক্রের মধ্যে হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল। সারিবাঁধা কামরা কিন্তু মানুষের সাড়া নাই। কামরাগুলির দরজা বন্ধ, বাইরের পথ দিয়া যাহারা যাতায়াত করিতেছে, তাহারাও নীরবেই পথ চলে। বদ্ধ কামরাগুলির দ্বারে দ্বারে টুলে বা বেঞ্চে যে সব আর্দালী চাপরাশিরা বসিয়া আছে, তাহারাও যেন এক একটী পুতুল। ফ্যানের বন্ বন্ আর টাইপ রাইটারের খট্‌খট্ ধ্বনি সেই স্তব্ধ আবহাওয়ার অদ্ভুত সুরে-বাঁধা সরব জীবন স্পন্দন।

দশ নম্বরের কর্তা হরিপদকে একটি সিগারেট ওফার করিলেন, হরিপদ ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করিল। Oh I see বলিয়া নিজে একটা ধরাইয়া কহিলেন, তারপর? আপনাদের চিনির টেণ্ডারটা খুব ভালই হয়েছে। রেট exactly what we wanted- Every thing's alright.

হরিপদ কহিল, তা'হলে আমরা আশা করতে পারি মিঃ...—

মিঃ আলি। বলিয়া ভদ্রলোক হরিপদর কথার উত্তর না দিয়াই বলিলেন, আপনারা নিশ্চয়ই একটা হিসেব করে দেখেছেন, এই পাঁচ লক্ষ টন চিনিতে কতো লাভ করবেন বলুন দেখি ?

হরিপদ উত্তর করিল, সে-কি এখনই বলা যায়—মিঃ আলি ?

ভদ্রলোকটী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলেন কি ? না বল্‌তে পেরেই কি এতোবড় একটা ঝুঁকি নিচ্ছেন ? দেখুন, আপনি নতুন লোক—কিন্তু রায় বাহাদুর সাহেবের ছেলে। আপনাকে আমাদেরে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে, সাহায্য করতে হবে। ধরুন এই যে রেট আপনারা দিলেন, আমরা যদি তা'— একটা চোখ ছোট করিয়া কহিলেন, বুঝ্‌তেই তো পারেন।

হরিপদর মনে পড়িয়া গেল, টেণ্ডার দেওয়ার আগের দিন পিতার নিকট হইতে একখানা বন্ধ এনভেলাপ সে বহন করিয়া মিঃ ভট্টাচার্যের কাছে হইয়া গিয়াছিল—তবে কি ?

মিঃ আলি আবার বলিতে লাগিলেন, আমাদেরও একটা ক্যাল্‌কুলেশন আছে। আমরা দেখছি, আপনারা প্রতিটন চিনিতে অন্ততঃ দুটাকা না হোক দেড় টাকা করে লাভ করবেনই। তা'হলে আপনাদের লাভের অঙ্ক দাঁড়াল, সাড়ে সাত লাখ। এখন আমরা, এই অফিসের লোকেরা মাস কয়েক পরেই

আপনাদের সিন্দুকে অস্ততঃ সাড়ে সাত লাখ টাকা তুলে দিচ্ছি ?

হরিপদ কি বলিবে খুঁজিয়া পাইতেছিল না, সে বলিল, হয়তো তাই।

তা'হলে বুঝুন। মিঃ আলি নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিলেন, এখন এতে আমাদের স্বার্থ কি ? যুদ্ধের এই দুর্দিনে আমরাও মানুষের মতো বাঁচতে চাই—কে না চায় ? তাছাড়া দেখুন দিকি যুদ্ধে কি ভাবে অর্থের অপব্যয় হচ্ছে, সবাই চারদিকে টাকা ছড়াচ্ছে মশাই। এক একটা গোলার দাম কত, একটা বোমার ? রোজ ক' কোটী টাকার গোলাগুলির অপব্যয় হচ্ছে ? কিন্তু আমরা তো অপব্যয় করছিনা, আমরা খেয়ে পরে, ভবিষ্যতের সংস্থান করে বাঁচতে চাইছি। আপনারাও অর্থ চান এই বাঁচবার জন্যই, আমাদেরও চাই তো ?

হরিপদর বিস্ময় বাড়িয়া চলিয়াছিল, লোকটী কি বলিতে চায় ?

মিঃ আলি আর একটি সিগারেট ধরাইয়া বলিলেন, আমার স্পষ্ট কথা। এই কণ্ট্রাক্ট আপনারাই পাবেন, রায় বাহাদুরের ছেলে আপনি। অবশ্যি, কণ্ট্রাক্ট যাবে জনসেবা সাপ্লাই কোম্পানীর নামে—এটুকুর প্রয়োজন আছে। তা' এও যা', তা'ও তা'। তবে আজই আপনাদেরে পঞ্চাশ হাজার টাকা এখানে জমা দিতে হবে—Payment যখন পাবেন তার আগে দিতে হবে আরো পঞ্চাশ হাজার। আর কেউ হলে দেড় লাখের

কমে চলতনা—সাড়ে সাত লাখ প্রফিটের ব্যাপার, বুঝ্‌তেই তো পারেন? আপনাদের সব রেডি হয়ে আছে—কেবল···

হরিপদর কান ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছিল, সে কি বলিবে, কি করিবে খুঁজিয়া পায়না, আবার সেস্থান ত্যাগও করিতে পারেনা। চেয়ারখানা যেন তাহাকে জোরে আঁকড়াইয়া রাখিয়াছে।

মিঃ আলি আবার বলিলেন, চিন্তা নেই—**unless instructed** আমি কিছু বল্‌তে পারি না। তারপরই একটু বাঁকা হাসি হাসিলেন—আর আপনার তো মশাই, ডবল প্রফিট। এটাকাটার একটা অংশও তো আপনিই পাচ্ছেন কি না।

এইবার এ-ইঙ্গিত হরিপদর রক্তিম মুখে কালি লেপিয়া দিল। তার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। জোর করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তা'হলে আমি এখন আসি—মিঃ আলি, নমস্কার।

হ্যাঁ, আসুন। মিঃ আলী বলিলেন, তবে তিনটার মধ্যে ফিরে আস্‌বেন—বড় সাহেব আবার সাড়ে তিনটায় বেরিয়ে যাচ্ছেন। নমস্কার।

সে করিডরে দেখিল রায় বাহাদুর গম্ভীর ভাবে ধীরপদে কোথা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন। তাহার পাশ দিয়া যাইবার কালে কোন কথাই বলিলেন না, রায় বাহাদুরের মুখে শুধু একটুখানি মৃদু হাসি খেলিয়া গেল।

হরিপদ এবার লিফ্‌টে চাপিল না। বাড়ীটা চারতলা, লিফ্‌টের ব্যবস্থা আছে একথা যেন সে ভুলিয়াই গেছে। সে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়াই নামিবে। সিড়ির মুখেই ওরিয়্যাণ্টেল বিজনেস সিণ্ডিকেটের কেশিয়ার কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল, স্যার!

হরিপদ না থামিয়াই উত্তর দিল, কি?

কেশিয়ার কহিল, চলে যাচ্ছেন স্যার? আমি এখানে থাক্‌ব? হরিপদ কহিল, জানিনা।

জানিনা? কেশিয়ারের চক্ষু বিস্ফারিত হইল। সে দ্রুত ফোনের সন্ধানে ছুটিল। ফার্মের বড় সাহেবকে ফোন করিতে হইবে।

ওরিয়্যাণ্টেল বিজনেস্ সিণ্ডিকেট হইতে দু'বার ফোন আসিয়াছিল, বড় সাহেব মিঃ ভট্টাচার্যের ও ছোট সাহেব মিঃ আলমের কাছ থেকে। হরিপদ জানাইয়া দিয়াছে সে অসুস্থ, অফিসে ফিরিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নয়।

মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরে খোকা, অসুখ বিসুখ কিছু করল? এতো সকালে যে ফিরে এসে বিছানায় পড়ে রইলি?

হরিপদ উত্তর দিল, কিছু হয়নি মা! অমনি—কাজ কর্ম নেই।

মা তাহার কপালে গায়ে হাত বুলাইয়া দেখিলেন।

তিনি অসুখ বিসুখ কিছু হয় নাই জানিয়া লইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, আবার ফিরিয়া আসিলেন। ডাকিলেন, খোকা!

—কি?

—কাল আমার দু'বস্তা চিনি আর বস্তা দুই ময়দা চাই খোকা। সইয়ের মেয়ের বিয়ে, আমি কথা দিয়ে এসেছি—আমিই এগুলো দেব।

হরিপদ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে মার মুখের দিকে চাহিল। কহিল, আমি এগুলো কোথায় পাব মা?

মা হাসিলেন, শোন বোকা ছেলের কথা? ওই তোদের ভট্টাচার্য সাহেবই তো এদ্দিন বস্তা বস্তা চিনি-আটা-ময়দা, তেল নুন জুগিয়ে এসেছে রে? এখন আবার ওঁকে দিয়ে তাকে বলাতে হবে—যখন তুই নিজেই সেখানে আছিস্? কাল সন্ধ্যায় কিন্তু ও'দের লোক মোটর নিয়ে আস্বে।

মা খোকার কোন উত্তর না শুনিয়াই আদেশটা জানাইয়া বাহির হইয়া গেলেন। আর হরিপদ সত্যই অনেককাল আগেকার খোকারই মতো বোকা দৃষ্টিতে ছাদের দিকে চাহিয়া পড়িয়া রহিল।

কতোক্ষণ পর হঠাৎ হুড়মুড় করিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া নমিতা তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল, দাদা! দাদা আছো তো? ওঃ বাবা, বিছানায় পড়ে যে?

হরিপদ দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিল।

নমিতা হাতের ভ্যানিটী ব্যাগ হইতে ছোট রুমালখানা বাহির করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে কহিল, আমরা একটা নোঙরখানা খুল্‌ব দাদা, নিছক মেয়েদের উদ্যোগে মেয়েদের জন্যে—একেবারে পুরুষ সম্পর্কহীন। তার জন্য টাকা তুলব এম্পায়ারে একটা শো করে, এই—নৃত্যাভিনয় আর কি? শিবের 'তপঃভঙ্গ' কর্‌ব, সেই ধ্বংসের দেবতা তোমাদের শিব। এ অভিনয়ের যা' খরচ—সব দেব বলে আমি কথা দিয়ে এসেছি। এখন সে আড়াই হাজারটী টাকা দেবে তুমি—ওরিয়্যাণ্টেল বিজনেস্‌ সিণ্ডিকেটের পার্টনার আরও কি বলে ওই, সিকিওরিং ম্যানেজার।

হরিপদ কোন উত্তর দিল না। নমিতা একাই বলিয়া যাইতে লাগিল, বাবাকে বল্‌তে পারব না, তোমাকেই দিতে হবে। সবাই বলে, এখন তো তুমি টাকার ওপর দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করবে? হবেইনা কেন? এতো বিজনেস্‌—বাবা তো চাকরী করেন কিন্তু জান দাদা রোজ এক দু'হাজার নিয়ে আসা—এতো তুচ্ছ নৈমিত্তিক ব্যাপার। মনে রাখবে কিন্তু—আমরা depend করছি শুধু তোমারই ওপর, entirely.

হরিপদ ভাবে, এই নমিতা পর্যন্ত জানে—তাহার বন্ধুরাও

জানে সে টাকা মাড়াইয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে—কিন্তু মাত্র পনর দিন হইল তাহার ব্যবসায়ী ও ম্যানেজারী জীবনের আরম্ভ। অর্থের রাজ্যে সে কি ভোজবাজী খেলিবে ?

আজই সুচরিতার জন্মদিন। সকালে এই কথাটা বারবার মনে হইয়াছে, কিন্তু ক্রমশঃ বিস্মৃতির তলায় তাহা ডুবিয়া গিয়াছিল। আবার তাহার মনে হইল, যখন বারান্দার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দু'টা বাজিয়া গেল। সে অকস্মাৎ বারান্দার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিল, দরজার পাশে দেয়ালে বড় ক্যালেণ্ডার-টাতে লাল কালির আঁচড়ে রক্তিম বিচিত্রিত হইয়া ঘোষণা করিতেছে, আজ একটা স্মরণীয় দিন—সুচরিতার জন্মদিন। সুচরিতা—তাহার বহুকালের সহপাঠিনী প্রিয় বান্ধবী—তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের বাঞ্ছিতা মধুময়ী সহধর্মিণী।

পোষাক পরিয়া ধীরপদে যখন সিড়ি বাহিয়া হরিপদ নীচে নামিতেছিল, সিড়ির পাশেই দোতলায় পিতার বৈঠকখানার নিকটে আসিয়া সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। পিতা কখনই ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু একবারও তাহার খোঁজ করেন নাই। সহসা কাহার কথার স্বর ভাসিয়া আসিল, নিশ্চয়ই মিঃ ভট্টাচার্য। মিঃ ভট্টাচার্য সহসা হাসিয়াও উঠিলেন।

হরিপদ এইবার দ্রুতপদে নামিয়া গেল। বাড়ীর সম্মুখে গাড়ীবারান্দার পাশেই তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, বহুকালের বন্ধু দেবব্রত। দেবব্রত কহিল, কোথায় যাওয়া হচ্ছে মশাই সিণ্ডিকেটের ছোট সাহেব? তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে, ফিরে চল দেখি বাড়ীতে?

হরিপদ কহিল, সময় নেই ভাই। অন্য সময় হবে। তা' এদ্দিন কোথায় ডুব মেরেছিলে?

সময় তোমাকে করতেই হবে—দেবব্রত দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, এতকাল টাকা হাত্ড়ে বেড়াচ্ছিলাম। তোমার কাছেও আসা সে-জন্যেই।

হরিপদ চলিতে লাগিল, আমার কাছে তো টাকা নেই?

দেবব্রতের চক্ষু বিস্ফরিত হইল, ওঃ টাকা নেই? সাত আট লাখ টাকা লাভের কণ্ট্রাক্ট বাগিয়েছ কি না? এখন আমার কথা হচ্ছে, আমি তোমাদের মালগুলি কেরিংএর ভারটা চাই মাত্র। গাড়ীতে মালগুলি তোল্ব, যথাস্থানে নামিয়ে সরকারকে সম্‌ঝে দেব। তোমাকে বলতে বাধা নেই হরিপদ, মিলিটারী ঘিয়ের উঠানো-নাবানর ভার নিয়ে বেশ কয়েক হাজার পেয়েছি—প্রতি একশত টিনে কুড়ি থেকে তিরিশ টন।

হরিপদ তখন রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে। সে কহিল, আমি তো কোন কণ্ট্রাক্টই বাগাইনি দেবু। আর এতে করে তুমি কি লাভ করবে? কিছুই বুঝছি না আমি।

দেবব্রত চটিয়া গেল, তা'হলে বল যে, এ কাজটা আমাকে দিতে চাও না। পাঁচ লক্ষ টনে অন্ততঃ বিশ হাজার টন চিনি তো মারবে বাবা তা গরীব বন্ধুর হাত দিয়েই মার, সেও কিছু অংশই না হয় পেল ?

হরিপদ সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, আমি যাচ্ছি দেবু, আজ সুচরিতার জন্মদিন।

দেবু মুখ বাঁকাইল, তুমি একেবারে হোপ্‌লেস্‌। চিরকাল-টাই সেই এক সুচরিতার জন্মদিন নিয়ে কাটাবে ? ইয়ংম্যান, অর্থশালী, একজনের জন্মদিন পুরোন হবে, আরো কতোজনের জন্মদিন আস্‌বে—আবার তা'ও যাবে—

হরিপদ ট্রামের লাইনের দিকে দাঁড়াইয়া চাহিয়া আছে।

দেবু কহিল, তা' একজনেরই জন্মদিনের উৎসাহে তুমি মেতে বেড়াও আমার ক্ষতি নেই, কিন্তু কাজটা কি সত্যি দেবে না ?

কিছুক্ষণ থামিয়া দেবব্রত বিদ্রুপপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, মনে রেখো পিতা পুত্রের এই যোগাযোগ সংবাদপত্রযোগে সর্ব্বত্র আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে ?

হরিপদ তখন গিয়া চলন্ত ট্রামে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, সেখান হইতে ছুটিয়া আসিয়া দেবব্রতের নাকে একটা ঘুসি বসাইয়া দিল।

দেবব্রত নাকটা চাপিয়া ধরিয়া ভীত আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, What do you mean by this ?

দেবব্রত যত আর্ত্ত প্রতিবাদ করে হরিপদ ততই তাহাকে আঘাত করে। সে যেন সেদিনকার তাহার অন্তরের সঞ্চিত সমস্ত ক্রোধ, অভিমান, বিক্ষোভ এমনি আঘাতে আঘাতে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে চায়। রাস্তায় মুহূর্তে একটা ভীড় জমিয়া গেল। হৈ চৈ, হল্লা।

হরিপদ আবার গিয়া একটা ট্রামে চড়িয়া বসিল। অল্পের জন্য মিলিটারী বাস-চাপা পড়িয়াছিল আর কি!

. . .

সুচরিতার জন্মদিনের উৎসব এইবার অনুষ্ঠিত হইতেছে পরিবর্তিত পটভূমিকায়।

পূর্ববৎসর উৎসবটা ছিল বিষাদাচ্ছন্ন—কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কারাগারে,—দেশের বিপর্যস্ত ভাব পূরোপুরি কাটে নাই, তারপর মহাত্মাজীর অনশন। হরিপদর দেওয়া খদ্দরের শাড়ীখানা পরিয়া বন্ধুবান্ধব ও অতিথিদের সুচরিতা অভ্যর্থনা করিয়াছিল হাস্যমুখে—কিন্তু মহাত্মাজীর প্রতিকৃতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের দীর্ঘজীবন লাভের প্রার্থনায় সুচরিতার কপোল বাহিয়া জলধারা ছুটিয়াছিল।

এবারকার উৎসবে সে বিপ্লবের ঝড় আর নাই কিন্তু আকাশ নির্মেঘও নয়। যদিও নেতৃবৃন্দ কারাগারেই—তথাপি সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বাংলায় তখন কালের আর এক আঘাত চলিয়াছে, তাণ্ডব সুরু হইয়াছে—তেরো'শ' পঞ্চাশের মৃত্যুতাণ্ডব। কিন্তু সুচরিতাদের ক্ষুদ্র গৃহে সেদিনের জন্য সেই অবস্থার কোন ছায়া পড়িতে সুচরিতা দেয় নাই।

হরিপদ যখন সুচরিতাদের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন অনেক দেরী হইয়া গেছে। সুচরিতা অনেকক্ষণ ধরিয়া মনে মনে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে, হরিপদর তো এই দিনটাতে দেরী হইবার কথা নয়? এদিনটী শুধু সুচরিতারই জন্মদিন নয়, তাহাদের দু'জনের পরস্পর আত্মনিবেদনের মধুময় স্মৃতি-বাসর।

হরিপদ আসিয়া দেখিল, যাহারা আসিয়াছিল তাহাদের অনেকেই চলিয়া গেছে, রহিয়াছে শুধু দু'একজন।

একজন হরিপদকে এমন সুরে অভ্যর্থনা করিল যাহা খুব শ্রুতিমধুর নয়। সুচরিতার বান্ধবী অসীমা সেদিন হরিপদর সঙ্গে একটু যেন গায়ে-পড়িয়াই বেশী করিয়া কথাবার্তা কহিল।

হরিপদ বিদায় নিবার আগে একান্তে সুচরিতা তাহাকে প্রশ্ন করিল, আজ তুমি এমন উন্মনা কেন?

উন্মনা? হরিপদ উত্তর দিল, মন আমার একেবারে হারিয়েই গেছে।

সুচরিতা কৌতুকপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, তাই বোধ হয় আজকার

দিনে আমাকে একটা উপহার দেওয়ার কথাও ভুলে গেছ ?

হরিপদ ম্লান হাসি হাসিল, হয়তো তাই। কিন্তু উপহারের চেয়ে আমার উপস্থিতির মূল্য কি কম ? .

নিশ্চয়ই নয়, সুচরিতা একটু তরল হাসি হাসিল, তুমি ওরিয়্যাণ্টেল বিজনেস্ সিণ্ডিকেটের অংশীদার যে' ? তা আমাদের বিজন মুখুজ্জে কি উপহার দিয়ে গেল জান ? একছড়া হার, দাম অনেক নিশ্চয়। তারপর—আরো—

হরিপদ সুরচিতার কথায় বাধা দিল আমার কাছ থেকে তুমি কি প্রত্যাশা করেছিলে ?

সুচরিতা কহিল, অন্ততঃ হাজার কয়েক টাকার একটা তোড়া?

হরিপদর মুখখানা গভীর আঁধারে ভরিয়া গেল । সে কহিল, আমি জানি। আজ আমি জানি, এপৃথিবীতে সবাই এ-ই চায়, অর্থ ই সব তা' যে কোনো উপায়েই অর্জিত হোক। আর জানি বলেই আমি রিক্তহস্ত অসহায়।

হরিপদর কথায় সুচরিতা যেন কিসের আভাষ পাইল। তাহার কণ্ঠে একটুখানি ব্যাকুলতা। সে কহিল, কি বলছ তুমি, খুলে বল।

হরিপদ উঠিয়া দাঁড়াইল, আমি যাই সুচরিতা। অন্যান্যবার তোমার জন্মদিনে স্মরণ করতাম, সেদিনটা তোমার জন্মদিন— আর আজ স্মরণ করছি, শুধু তোমারই জন্মদিন নয়, আমারও নতুন জন্মদিন।

হরিপদ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল! সুচরিতা তাহাকে ডাকিয়া থামাইতেও অবসর পাইল না।

বাইরের রাস্তায় তখন ব্ল্যাকআউটের আঁধার ও জনতার সমারোহ। ট্রাম বাস, মিলিটারী গাড়ীর ভিড়, বিচিত্র জনতা, অদ্ভুত শব্দের কলরব। তাহার মাঝে মিশিয়া গেছে হরিপদ। কিন্তু সুচরিতার দৃষ্টি সে-দিকে নিবদ্ধ হইয়া আছে। স্তব্ধ নির্বাক ভাবে সে হারিয়ে-যাওয়া হরিপদকেই খুঁজিতেছে।

তেরোশ একান্ন সাল, তেরোই মাঘ। আবার সুচরিতার জন্মদিন।

পলাশপুরের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত আশ্রম। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে পিতৃমাতৃহারাদের অনাথাশ্রম। সেখানকার অধিবাসীদেরে সেদিন সুরচিতা নিজের হাতে বিশেষ করিয়া খাদ্য বিতরণ করিতেছিল। সে প্রায় এগারো মাস যাবত এ-আশ্রমের ভার নিয়াই আছে।

পলাশপুরের গ্রাম্য পথ বাহিয়া একখানা সুদৃশ্য ক্রাইস্‌লার মোটরকার আসিয়া অনাথাশ্রমের প্রাঙ্গনে দাঁড়াইল। শিশুদের আহার শেষ হইয়াছিল, তাহারা দূরে থাকিয়া নির্বাক বিস্ময়ে

মোটর গাড়ীখানির দিকে চাহিয়া রহিল। সুরচিতা ধীরপদে আগাইয়া গেল।

মোটর হইতে অবতরণ করিল সাহেবী-পোষাক পরা হরিপদ আর বিচিত্র মূল্যবান সাজে সজ্জিতা, কপালে সিঁদুরের টিপ, চোখে কাজল, মুখে অপরূপ হাসিমাখা একটি তরুণী।

হরিপদ নামিযাই কহিল, আজ তোমার জন্মদিন, এটা ভুলে যাইনি সুরচিতা। আর আজ রিক্ত-হস্তেও আসিনি।

সুরচিতা নীরব হাস্যমুখে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে ইহাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

হরিপদ বলিল, দু'টী উপহারই আজ নিয়ে এসেছি। একটী—আমারই স্ত্রী, কোটীপতি ব্যবসায়ী মিঃ ভট্টাচার্যের কন্যা শ্রীমতী নীলিমা, আর এই খামে আছে দশ হাজার টাকা।

সুরচিতা হাত বাড়াইয়া দু'টী উপহারই গ্রহণ করিল, তারপর একটু থামিয়া হাস্যমুখে কহিল, তোমার স্ত্রীকে আমি ধন্যবাদের সঙ্গে তোমাকেই ফিরিয়ে দিলাম তোমারই জন্যে—আর টাকা-

গুলো গ্রহণ করলাম—আমার জন্যে নয় ....
গেলবারের উপহারগুলো এই সব নিরন্ন আশ্রয়হীনদেরে

আশ্রয় দিয়েছিল, এদের মুখে অন্ন দিয়েছিল, এবার চেষ্টা করব তাদের মুখে উজ্জ্বল হাসিও ফুটিয়ে তুলতে।

তারপর আর একটু থামিয়া সুরচিতা কহিল, আজ ত তোমারও 'জন্মদিন'? আমাকেও একটা কিছু দিতে হয়, নয় কি?

সুরচিতা গলায় আঁচল দিয়া হরিপদকে প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া কহিল, আজ একটীবার অতীতের তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ করো, আমি যেন তোমাকে কখনো ঘৃণা না করি।

মাথার উপর দিয়া বিকট শব্দ করিয়া ঝড়ের বেগে একখানা বিমান ছুটিয়া যাইতেছিল যেন পিছনদিকে মরণাস্ত্র লইয়া কাহারা তাড়া করিয়া আসিতেছে। হরিপদর মনে হইল সেও যদি এমনি ছুটিতে পারিত।